# মালতীদির গল্প

প্রতিভা বসু

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

প্রথম সংস্করণ :
৭ই ফাল্গুন,
১৮৭৯ শকাব্দ

দু টাকা
আট আনা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি. এ.
২৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়
ক্যাশ প্রেস, ৩০ কর্ণওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

কাল মালতীদিকে দেখলাম। মার্কেট থেকে ফিরছিলাম, ছু'হাত ভর্তি নানা সাইজের প্যাকেট ; একটা ট্যাক্সির আশায় তৃষিত হয়ে তাকিয়ে ছিলাম অসংখ্য যানবাহন সঙ্কুল চৌরঙ্গীর গড়ের মাঠ বিস্তীর্ণ বিশাল রাস্তাটির দিকে। আপিস ছুটি হয়েছে, স্রোতের মতো মানুষের মিছিল দিগ্বিদিকে গাড়ি বোঝাই হ'য়ে চলেছে, একটি ট্যাক্সি খালি দেখা যাচ্ছে না, দাঁড়াতে দাঁড়াতে প্রায় পা ব্যথা হ'য়ে গেল, এমন সময় লিনজে স্ট্রীটের মোড়ে তাকিয়ে দেখলাম মালতীদি। মুখে একটা অস্পষ্ট হাসি, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা, যেন কোনো উদ্দেশ্য নেই। ছু'খানা ধুলিধূসরিত নগ্ন পায়ে আপন মনে হেঁটে চলেছেন। কতদিনের না-আঁচড়ানো রুক্ষ চুল জটবহুল। তৈলহীন, জলহীন। তার উপর খানিক খানিক উঠে গিয়ে মাথার পিছন অংশ দেখা যাচ্ছে। ঘাড়ের কাছে যে-চুল আগে ঘনতায় থোকা হ'য়ে মেঘের মতো কাল রং নিয়ে লুটিয়ে থাকতো সে-চুল এখন ছু'গাছি শনের মতো বাতাসে উড়ছে। সারা গায়ে একটা শতচ্ছিন্ন ফুটোফাটা ধূসর রংয়ের জুটকম্বল জড়ানো।

আমার সঙ্গে আমার বড়দির ছেলে সুবীর ছিলো, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে সে-ই আমাকে দেখালো। 'মাসী, তোমার মালতীদি।' আমি চকিত হ'য়ে তাকিয়ে বললাম, 'মালতীদি? কই রে?'

'ঐ ছাখো। কী রকম।'

'তাই তো।'

মালতীদি আপন মনে হাসছিলেন মুখ টিপে টিপে, কী যেন

বিড়বিড় করছিলেন ঠোঁট নেড়ে নেড়ে। মুখ তুলে আমাদের দিকে তাকিয়ে তিনিও থমকালেন।

আমি স্তব্ধ হলাম।

বিকেলের ধূসর আলো রঙিন ছায়া ফেলেছে রাস্তার উপর। উল্টো দিকে গড়ের মাঠের দিগন্তে অস্তমান সূর্যের রক্ত আভায় সারা চৌরঙ্গী উদ্ভাসিত; মালতীদির-ফাঁকা-হ'য়ে যাওয়া চুলে, মুখে, মাথায়ও তার স্পর্শ। মাঝে মাঝে গঙ্গার বুক থেকে উঠে আসছে হু হু হাওয়া, সেই হাওয়ায় খাড়া হ'য়ে উঠছিল পাতলা শনের দড়ির মতো চুলগুলো। আমি ভয় পেয়েছিলাম। চেহারার দিকে তাকিয়ে নিজেরই অজান্তে চট ক'রে কখন জানি ফুটপাতে উঠে স'রে দাঁড়িয়েছিলাম।

মালতীদি দ্রুত পায়ে কাছে এসে থামলেন, হেসে বললেন, 'ঠিক চিনতে পেরেছি। তুমি আমাদের মণি না?'

মুখের উপর তাড়াতাড়ি একটু আলগা হাসি ভাসিয়ে দিয়ে চমকানো গলায় বললাম, 'হ্যাঁ। আপনি—মানে আপনি তো—'

'আমি শ্রীমতী মালতী দেবী চৌধুরানী।' তৎক্ষণাৎ বুক টান ক'রে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মালতীদি, সম্রাজ্ঞীর ভঙ্গিতে। বুকের উপর থেকে ছেঁড়া কম্বলটা সরে গিয়ে একটা রুগ্ন দেহের আভাস সুস্পষ্ট হ'লো। মুখের ভাবটা রীতিমতো কঠিন ক'রে বললেন, 'মিসেস নরনারায়ণ চৌধুরী, রানী অফ গোপালনগর।'

চোখ ফিরিয়ে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চুপ করে রইলাম।

সুবীর বললো, 'চলো।'

মালতীদি বললেন, 'একটা টাকা দিতে পারো?'

আমি তক্ষুনি ব্যাগ থেকে একটা টাকা বার ক'রে দিলাম।

মালতীদি সামনের দু'টি ভাঙা দাঁতে বীভৎসভাবে হাসলেন, তাঁর

ছোটো ছোটো করমচার মতো চোখে সহসা দুই বিন্দু জল টলমল ক'রে উঠলো, মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালেন তিনি। আবার তখুনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার মাসোহারাটা কিনা এখনো আসেনি, তাই ভারি অসুবিধেয় প'ড়ে গেছি। আমাদের হ'লো গিয়ে বারো লক্ষ টাকার এস্টেট। সে কি একটা যে সে কথা? আর তার প্রধান বৌ-রানী হ'লাম আমি। বুঝতেই তো পারো সেই মাসোহারা। সে যে কত!'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'তাই তো।'

সুবীর গোপনে আমার হাত টিপলো, 'মাসি, চলো।'

বুঝলাম ও ভয় পেয়েছে, আমারও অবিশ্যি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলবার মতো মনের জোর খুব বেশী ছিলো না, তাই তাড়াতাড়ি নিঃশব্দে পা বাড়িয়েছিলাম, কিন্তু মালতীদি ছাড়লেন না। পিছে পিছে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'আমাকে ওরা আটকে রেখেছে কিনা। তাই তো যতো মুশকিল।'

আমি ক্ষীণ গলায় বললাম, 'কারা?'

'কেন?' এমন একটা কথা জানি না দেখে মালতীদি অবাক্। 'আমার দাদারা? ওরা বলে কী জানো? স্বামীকে ছাড়ো, নইলে মেরে ফেলবো। এই ছাখো না ধাক্কা দিয়ে ফেলে কেমন দাঁত ভেঙে দিয়েছে।'

'সত্যি?'

'তা নয় তো কি বাজে কথা বলছি?'

'না, না; তা বলেননি—'

'আমার যে পিসতুতো বড়ো দাদা সেই চিদানন্দ দত্ত কাব্যনিধি, জানো তো তাকে? নাম শুনেছ তো? অত বিদ্বান, বুদ্ধিমান, আর দিগ্‌গজ পণ্ডিত। বলে কী, "ও আবার একটা স্বামী, ও একটা

শুয়োর।” লজ্জায় দুঃখে মালতীদি যেন অভিভূত হলেন। আর আমি ভয়ে অভিভূত হ'য়ে বললাম, ‘চিদানন্দ দত্ত মারা গেছেন না?’

‘আহা মারা তো গেছেন, তাতে কী হয়েছে? ওর দেহটাই নষ্ট হয়েছে—আত্মাটা তো আর যায়নি? আত্মার তো বিনাশ নেই। কেবল পুরোনো খোলস ছেড়ে নতুন শরীর ধারণ করা। ঠিক যেন গাছের বাকল। কিন্তু জানিস ও লোকটা কেন এখনো কোনো নতুন দেহে ঢুকতে পারছে না?’

আমি ঢোক গিলে বললাম, ‘না।’

‘আমাকে যন্ত্রণা দেবার জন্য। শুধু আমাকে জ্বালাবার জন্যই ও এখনো জন্মাতে পারছে না। তা নৈলে পরিবারে তো এরি মধ্যে কম বাচ্চা হ'লো না? এলে আসতে পারতো না?’

সুবীর আস্তে আমার কাঁধের উপর হাত ছোঁয়ালো, ‘মাসি, চলো।’

যাবো কী, মালতীদি যে ছাড়েন না। আমার শাড়ির পিছন দিককার লম্বমান আঁচলটি টেনে ধরে বললেন, ‘জানিসতো ভূমি, জল, তেজ, বায়ু আর আকাশ এই পাঁচটি হ'লো মহাভূত। আর এদের মধ্যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস আর গন্ধ এই পাঁচ হ'লো পৃথিবীর গুণ। শব্দ, স্পর্শ আর রূপ এরা তেজের গুণ, শব্দ আর স্পর্শ বায়ুর গুণ, আর একমাত্র শব্দই হ'লো আকাশের গুণ। আর এই পাঁচ গুণ এভাবেই পাঁচভূতে মিলে পঁচিশ সংখ্যা হয়—’

অনির্দেশ্যভাবে সামনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে কাতরভাবে বললাম, ‘আমার একটু কাজ আছে মালতীদি।’

মালতীদি বললেন, ‘পাপ চিন্তা, পাপ কথা, আর পাপীর আচরণ এই সব অধর্ম যদি মানুষের বুকের ভেতর প্রবেশ করে তা হ'লে তার সংগুণ সব বিনষ্ট হবেই হবে। এই যে লোকটা এতো লেখাপড়া

শিখলো, এতো সৎভাবে জীবনযাপন করলো, তুই-ই বল্ তার লাভটা হ'লো কী? আমিতো বলেছি ঐ চিদানন্দ দত্ত মশাইকে আর কোনোদিন মনুষ্যদেহ নিয়ে জন্মাতে হবে না পৃথিবীতে, ওর জন্ম তীর্যক যোনিতে হবে। কর্মফল বলে একটা জিনিস আছে মানিস্‌তো? এই তো সেদিন আমি আমাদের পুরনো বালিগঞ্জের বাড়িটাতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ বাতাস ছুটিয়ে আমাকে উল্টে ফেলে দিল। আমার যে স্বামীর সঙ্গে একটা মিল হয় সেটা ও মোটে চায় না।'

আমি বললাম, 'ভারি ইয়ে তো। কিন্তু আমি এখন যাই।'

'ও, যাবি? কিন্তু বড়ো দরকারি কথা ছিলো যে একটা—'

'সে না হয় আর একদিন হবে।'

'আরেকদিন!' খুব চিন্তা করতে লাগলেন মালতীদি, দুই চোখ ছোট ক'রে বাঁ হাতের নখের সঙ্গে ডান হাতের নখ ঘষতে ঘষতে আনমনা হ'য়ে ক্রমাগত বলতে লাগলেন, 'আরেকদিন! আরেকদিন!' তারপর হঠাৎ দুই চোখ তাঁর চকচকে হ'য়ে উঠলো, সামনে তাকিয়ে কী যেন দেখতে পেলেন তিনি, আমাকে সম্পূর্ণ ভুলে ছুটে গেলেন সেখানে। আমি তাকিয়ে দেখলাম দু'জন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে আইসক্রীম চুষতে চুষতে কাঠি দুটো ফেলে দিল রাস্তায়।

## ২

এই মালতীদিকে আমি প্রথম দেখেছিলাম ঢাকায়, আমার বন্ধু মঞ্জুশ্রীর বাড়িতে, তার আত্মীয় হিসেবে। রমনার একখানা ছোট্ট দোতলা বাড়ির ছাদ, যে ছাদের অর্ধেক জুড়ে একটি মস্ত লিচু গাছ আর আম গাছ এক সঙ্গে বুনট হ'য়ে মস্ত ছায়া বিছিয়ে রেখেছে নকশি-কাটা শীতল পাটির মতো, সেই ছায়ার তলে স্নান ক'রে চুল

মেজে দিয়ে তন্বী গৌরাঙ্গী এই মালতী রায় ব'সে-ব'সে একখানা কবিতার বই পড়ছিলেন। মঞ্জুশ্রী আলাপ করাতে নিয়ে এলো। তখন সবে বিলেত থেকে ফিরেছেন, চোখে মুখে সারা চেহারায় সাগরপারের লালচে আভা তার সমস্ত উচ্ছলতা নিয়ে ছড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে বইয়ের ভাঁজে আঙুল রেখে হাসলেন, 'এসো। মঞ্জুর কাছে এত শুনেছি যে নির্ভুলভাবেই ব'লে দিতে পারি তুমি মণিমালা, এই শহরের বিখ্যাত গাইয়ে। বলো ঠিক কিনা।'

ছোটো আর ভাসা চোখে হাসির আলো উপচে পড়লো। ভয়ানক ভালো লাগলো। আমি মুগ্ধ হ'য়ে তাকিয়ে রইলাম।

বয়সের ব্যবধান আমাদের কম নয়। আমি আঠারো, মালতীদি আটাশ। দশ বছরের ছোটো বড়ো। কিন্তু মুহূর্তেই সেই ব্যবধান ডিঙিয়ে বন্ধু হ'য়ে উঠলাম। মালতীদি বললেন, 'বোসো।'

ব্যস্ত হ'য়ে মঞ্জুও বললো, 'বসবে কী! বাঃ। যাবো না?'

'কোথায়?'

'বিধবা আশ্রমে একজিবিশন হচ্ছে না?'

'ও,' নরম ক'রে হাসলেন মালতীদি। 'সে বিকেলে যাওয়া যাবেখন। কী বলো?' তিনি আমার দিকে তাকালেন।

'বিকেলে! আশ্চর্য! বিকেলে তোমার চায়ের নেমন্তন্ন না?' মঞ্জু ভুরু কুঁচকোলো, 'তাছাড়া অত দূর থেকে মণিই আবার আসতে পারবে নাকি?'

'কতদূর?'

'সে অনেক। তুমি বুঝবে না। ঢাকা শহরের মানচিত্র তোমার দখলে নেই। চলো, চলো।'

আমি উঠছিলাম, কিন্তু মালতীদি আঁচল টেনে বসিয়ে দিলেন, 'একজিবিশন আজ না হয় কালই দেখা যাবে, কিন্তু এমন সুন্দর

সকাল তুমি আর কোনোদিন পাবে না। আকাশ দেখেছো? কী নীল! বাতাস কী সুন্দর ঠাণ্ডা।'

মঞ্জু রাগ ক'রে বললো, 'যা খুশি তাই করো, আমি কিছু জানিনে।'

'আর কিছু না জানো', মালতীদি হাসলেন, 'চা করতে তো জান খুব ভালো। লক্ষ্মীটি, দয়া ক'রে তার একটা ব্যবস্থা ক'রে দাও।'

এক কাপ নয়, এক পট। স্টোভ জ্বালিয়ে তৈরি করলো মঞ্জু। সঙ্গে ঢাকাই বাখরখানি আর কালাচাঁদের প্রাণহরা সন্দেশ। গল্প করতে-করতে ছাদের সেই টি-পার্টিটুকু স্মরণীয় হ'য়ে রইলো।

তারপর সেই বন্ধুতাই নিবিড় হ'য়ে উঠেছিলো দিনে দিনে। আর সেই সব দিনের ভালোলাগারও কোনো তুলনা ছিলো না। সবাই ঠাট্টা করেছে। গুরুজনের কাছে বকুনি খেয়েছি এই অদ্ভুত সাম্যহীন বন্ধুতার জন্য—কিন্তু তাতে কী?

বিলেতে মালতীদি পি. এইচ. ডি. হ'তে গিয়েছিলেন। ছাত্র-জীবনের কাহিনী তাঁর অতি উজ্জ্বল। কুমিল্লা কি নোয়াখালির কোনো এক গ্রামের নেহাত সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়ে তিনি। তাঁদের বাড়ির পুরুষেরাই কখনো বিশ্ববিদ্যালয় চোখে দেখেছে কিনা সন্দেহ, সেই বাড়ি থেকে এই। প্রথমে বাপ বৃত্তি-ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দিয়েছিলেন শখ ক'রে, যেমন শিশু বড়ো হ'তে থাকলেই পাঁচজন বাপ মা দিয়ে থাকেন। কিন্তু মালতীদি আর পাঁচজনকে ছাড়িয়ে সব পরীক্ষায় পুরো নম্বর রেখে বৃত্তি পেলেন সেখান থেকে।

ইস্কুলের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী মা বাপ সবাই খুশি হয়েছিলেন সেই সাফল্যে, কিন্তু সেই খুশি এতটা নয় যাতে মালতীর বাবা মালতীকে আরো পড়াবেন ভাবতে পারেন। কিন্তু বৃত্তিটাই সেই সুবিধে ডেকে আনলো। টাকা পাচ্ছে, তখন সবাই বললো পড়ুক। কিন্তু কোথায় পড়বে সেটাই হ'লো সমস্যা। সেই গ্রামে ছেলেদেরই হাই-ইস্কুল নেই, তারা তিন মাইল হেঁটে তবে গঞ্জের ইস্কুলে গিয়ে পড়ে, আর ক' জনেইবা পড়ে। তার মধ্যে একটা মেয়েদের হাই-ইস্কুল তো স্বপ্ন। চোদ্দো মাইল দূরে, শহরে অবিশ্যি একটা আছে, ওখানকার ইংরিজি শিক্ষিত চাকুরেরা অনেক ধরা-পড়া ক'রে বছর কয়েক যাবত চালু করেছেন ইস্কুলটি, সংলগ্ন আটচালা বোর্ডিংও আছে একটি, ব্যবস্থা ভালো, শিক্ষকরা ভালো, দু' একজন ছাত্রী ভালোও করেছে দু'এক বছর। শেষ পর্যন্ত কী ভেবে মালতীকে তিনি সেখানেই নিয়ে গিয়ে ভর্তি ক'রে দিয়ে এলেন। তাতে তার মা অর্থাৎ মালতীর ঠাকুমা অনর্থ করলেন অনেক, কিন্তু মালতীর বাবা মেয়ের অশ্রুপাতের কাছে মার অশ্রুপাতটাকে ততটা গণ্য করতে পারলেন না। এক কালে তাঁর নিজেরও বড়ো সাধ ছিলো লেখাপড়া করবার, মেয়ে তার ঘুমিয়ে পড়া সাধটাকেই বোধহয় নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছিলো। তাই মনের মধ্যে এই বিরোধিতার জোরটুকু সংগ্রহ করতে পারলেন তিনি।

সেখানে গিয়েও কিন্তু মেয়ে দ্বিতীয় হ'লো না কোনোদিন। ফলতঃ আরেকটা বৃত্তিও জুটে গেল ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরে। এবার বাবা থমকালেন। ততদিনে দশ বছরের ছোট্ট মালতী পনরো পুরে ষোলোতে পা রেখে দাঁড়িয়েছে। তাকলেন তিনি সেই মেয়ের দিকে, আর তাকিয়েই অনুভব করলেন যে সন্তানকে বুকের নিবিড়ে জড়িয়ে

তিনি এতোদিন শুধু ভালোবাসার আবেগেই ভরে উঠেছেন, সেই সন্তান এখন শুধু স্নেহের যোগ্যই নেই, শ্রদ্ধার যোগ্যও হ'য়েছে। মেয়েকে মনে মনে সমীহ করলেন তিনি। তারপর ভাববার জন্য মাত্র একটা নির্ঘুম রাত! কলেজে ভর্তি করতে আর একপলক চিন্তা করলেন না। আই-এ আর আই-এ'র পর বি-এ ওখানেই পড়া গেল, আর বি-এ পর যখন আর বিয়ের কথা কেউ তুললো না, যেন স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই মালতীদি কলকাতা চলে এলেন এম-এ পড়তে। এবং শেষ পর্যন্ত ঘটি-বাটি বন্ধক দিয়ে বাপ তাঁকে বিলেত পর্যন্ত পাঠালেন। এর পেছনে তাঁর অনেক আশা ছিলো বৈ কি। আশার চেয়ে ভরসা ছিলো বেশি।

যে-মেয়ে এত নিষ্ঠার সঙ্গে তরতরিয়ে পরীক্ষার শক্ত সোজা সব ক'টা সিঁড়ি এমন ক'রে ডিঙিয়ে এতদূরে এসে পৌঁছলো, তাকে আর অল্প একটুর জন্য অসম্পূর্ণ রাখার দরকার কী?

কিন্তু বিদেশে গিয়ে মালতীদি তাঁর বাপের ঘটিবাটি-বন্ধক-দেয়া টাকায় যে শুধু বিদ্যাই অর্জন ক'রে এলেন তা নয়, দু'হাতে দু'গাছা সরু শাঁখাও প'রে এলেন।

'বিলেতে শাঁখা? অবাক কাণ্ড!' আমি মুখের দিকে তাকালাম।

মালতীদি হাসলেন, 'আর বলো কেন? ওর পাগলামির অন্ত দেখিনি।'

'কার?' আমার চোখ জিজ্ঞাসায় বড়ো হ'লো।

'সে আমার এক বন্ধুর।' মালতীদি হাত বাড়িয়ে লিচু গাছের পাতা ছিঁড়লেন, 'কী না করলো এই এক জোড়া শাঁখার জন্য। পাগল। পাগল। এর দাম কতো জানো?'

আমার অল্পবয়সী মন কৌতূহলে ভ'রে উঠলো। শাঁখার দাম শুনতে আমার ঔৎসুক্য নেই, জিজ্ঞেস করলাম, 'কে সেই বন্ধু ?'

'কেন, হিংসে হচ্ছে নাকি ?' মালতীদির মুখের হাসিটি তেমনি অমলিন।

বললাম, 'হচ্ছেই তো।'

মালতীদি বললেন, 'ভয় নেই। তার সাধ্য নেই তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। সে মেয়ে নয়।'

এবার আমি হাসলাম, 'আহা, মেয়ে না হ'লে বুঝি আর মেয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে পারে না ? আমার প্রতিদ্বন্দ্বী আসলে তিনিই, যিনি আপনার জন্যে কতো কাণ্ড ক'রে কতো দাম দিয়ে এই শাঁখাজোড়া সংগ্রহ করেছিলেন, ভালোবেসে হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন।'

'ভালোবেসে !' মালতীদি হাসতে গিয়েও কেমন আনমনা হ'য়ে গেলেন। তাঁর মন আর চোখ দুই-ই আকাশে নিবদ্ধ হ'লো। মন খারাপ হ'লে এই তাঁর বিশেষ ভঙ্গি।

৩

সেদিন ঐ পর্যন্তই। পরে টুকরো-টুকরো ভাবে যা শুনেছিলুম তা এই : মালতীদি এঁর সঙ্গেই বিলেত যাবার সময়ে এক জাহাজে ভেসেছিলেন। সৌন্দর্যে অদ্বিতীয় এই মানুষ। গুণে, যোগ্যতায়, বন্ধুতায় অতুল্য। অন্তত মালতীদির তা-ই মনে হয়েছিলো।

আসলে মালতীদি পড়াশুনো নিয়ে ছাত্রকালটা এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, এই মুগ্ধ হবার দৃষ্টিটা এতকাল অন্ধ ছিল তাঁর। তা নৈলে এই মানুষটির সঙ্গে এই জাহাজের সহযাত্রী হ'য়েই যে প্রথম আলাপ হ'লো তা নয়। আরো অনেকবার, অনেক জায়গাতেই

দেখেছেন। কলকাতার রীতিমতো একজন বিশিষ্ট নাগরিক ইনি। এঁর বাপ এবং বিত্ত দুয়েরই খ্যাতি তখন বাংলাদেশের অনেক জায়গায় ছড়ানো। পাঠ্য পুস্তকের তলায় চাপাপড়া মন নিয়ে মালতীদি তখন লক্ষ্য করতে পারেননি। কিন্তু জাহাজে সে-ভার ছিলো না, মন ফাঁকা ছিলো, ফার্স্ট হবার জন্য গোগ্রাসে পেপার তৈরি করবার দায়িত্ব না থাকায় অবকাশ ছিলো প্রচুর, মোটা-মোটা বই হাতে নিয়ে চোখ অন্য দিকে পাঠিয়ে নানা কথা ভাববার কিংবা না ভাববার স্বাধীনতা ছিলো, অতএব মালতীদি এতদিনে মন আর চোখ একত্র ক'রে তাকাতে পারলেন এই অনন্ত পৃথিবীর দিকে। বুঝতে পারলেন এখানে ফুল ফোটে, বাতাস ছোটে, চাঁদের আলোয় মোহময় হ'য়ে ওঠে রাতগুলো, অন্ধকারে তারার চুমকি আকাশকে সাজায়, দিনের প্রখর রোদে হৃদয় ধূ ধূ করে, মেঘলা দিনে মন মানে না।

রমেন সেন যাচ্ছে ব্যারিস্টারি পড়তে, আর মালতীদি পি. এইচ. ডি.। এতকাল পরে হঠাৎ রমেনের ব্যারিস্টারি পড়ার শখ হ'লো কেন সেটা অবিশ্যি জিজ্ঞাসা করা যেতো, কেননা বি-এ পাশ করার পরে তার যতগুলো বছর কেটে গেছে মাঝখানে তার সংখ্যা নেহাত কম নয়! আর লণ্ডন শহরও তার অপরিচিত নয়। এই নিয়ে তৃতীয়বার। মালতীদি সাদাসিদে মানুষ, অত প্রশ্ন মনে এলো না তাঁর। আলাপ ক'রে খুশি হলেন, যত্নে কৃতজ্ঞ হলেন, সঙ্গটা বইয়ের চেয়েও উপভোগ্য মনে হ'লো। তাঁর হৃদয়ের বন্ধ দরজায় আস্তে-আস্তে করাঘাত করলেন ইনি। বসন্তের হাওয়ায় দুলে উঠলো ভেতরকার এতোদিনের গুমট আবহাওয়া।

জাহাজে শুধু নয়। লণ্ডন শহরে নেমেও কিন্তু রমেন 'গুড বাই' ব'লে বিদায় নিলো না পথের অন্যান্য সঙ্গীর মতো। মালতীদিকে

[illegible]স্নি ক'রে পৌঁছিয়ে দিলো তাঁর নির্দিষ্ট বাসস্থানে, খানিকক্ষণ সঙ্গ দান ক'রে ভেঙ্গে দিলো তার নতুন দেশে নতুন আসার সঙ্কোচ, তারপরের দিনও এলো, তারপরের দিনও। তারপর এবেলা ওবেলা এসে সব রকমে সহায়তা করতে লাগল যখন যা প্রয়োজন, শহরের অলিগলি চিনিয়ে দিলো সাত দিনে, আদপে কায়দায় ব্যবহারে এক মাসে এদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হবার মতো যোগ্য ক'রে তুললো। বেড়ালো পার্কে, খেলো রেস্তোরাঁয়, রাত্রিটুকু বিচ্ছিন্ন হবার আগে তাকালো চোখে-চোখে—তারপর একদিন মালতীদি সচেতন হ'য়ে উপলব্ধি করলেন রমেনকে তিনি ভালোবেসেছেন।

ছোটোখাটো নিতান্ত অসহায় গোছের মানুষ মালতীদি। বয়েস তাঁর চব্বিশ হ'লে হবে কী, চোদ্দ বছরের মেয়ের মতো সরল, সহজ, নিষ্পাপ মন। গায়ের রং হলদে, চিনেদের মতো, মুখ চোখ চোখা নয় কিন্তু লাবণ্যে ঢলোঢলো, করমচা ছাঁদের ছোটো-ছোটো দুটি ভাসা চোখ ভাবে ভাষায় সমৃদ্ধ। হাতের গড়ন গোল, পায়ের পাতা পদ্মের মতো কোমল আর সুন্দর। কালো রেশমের মতো নরম চুল পিঠ ছাওয়া নয়, কাঁধের উপর ঘন থোকায় আঙুরগুচ্ছের মতো অবলুণ্ঠিত।

রমেন মৃদু হেসে বললো, 'এতদিনে তবে দয়া হ'লো তোমার?'

মালতীদি চুপ ক'রে রইলেন।

'তা হ'লে আমর স্বপ্ন সার্থক হলো মালতী?'

'কী হবে?' হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে ব'লে উঠলেন মালতীদি।

রমেন তার নাক টিপে দিল, 'বয়স তোমার কত, খুকি?'

তারপর চললো বাড়ি খোঁজার পালা। মালতীদির ইচ্ছে ছিলো না, শুধু যে ছিলো না তা নয়, তিনি জেদও করেছিলেন এক বাড়িতে

না থাকার জন্য। করমচা চোখে বাঁকা তাকিয়ে প্রথম দিন অবাক হ'য়ে বলেছিলেন, 'বাড়ি? বাড়ি কেন?'

'বাড়ি নয়, ঘর। পাখিদের ছাখো না সময় হ'লে কেমন ঘর বাঁধে?'

'না।'

'কী না?'

'এই বেশ আছি।'

'বেশ আছো?'

'না না, ও-সবে দরকার নেই।'

'কী নিষ্ঠুব তুমি।' এর পবে গাঢ় গলায় বলেছিলো রমেন।

চুপ ক'বে থেকে মালতীদি লাল হ'য়ে বলেছিলেন, 'তুমি তো জানো একসঙ্গে থাকতে হ'লে তার একটা সামাজিক দায়িত্ব আছে।'

'বিলেতে এসেও সমাজ পাতাবে?'

'চিবদিনই কি বিলেতে থাকবে? দেশে যাবো না?'

'বম্বেতে নেমেই একপাতা সিঁত্বর কিনে দেব, সারা কপালে, "সতী নারীর পতিই একমাত্র গতি" চিহ্ন লেপে বাড়ি গিয়ে উঠো।'

'বম্বেতে কেন, সেটা তো এখানে একবাড়িতে থাকার আগেই হ'তে পারে।'

'কেন, আইনেব ফাঁদে না জড়ালে পালিয়ে যাবো ব'লে ভয় করছে তোমার?'

'তা কেন?'

'তবে?'

'তবে আবার কী? একসঙ্গে থাকবো অথচ এদিকে—'

একথা শুনে রাগ করলো রমেন। আর কিছু না ব'লে হনহন

ক'রে চ'লে গেল ভারি মুখে। আর মালতীদি উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটলেন পেছনে।

রমেন রাগ করলে কি তিনি থাকতে পারেন ?

'ভালোবাসি। ভালোবাসি। ভালোবাসি।'

একদিন কথা বন্ধ রেখে, মিলন হবার পরে অস্থির আবেগে বলেছিলো রমেন, 'এই আমার একমাত্র মন্ত্র, এ ছাড়া আর কিছু নয়। তার জোরেই যদি তুমি আমাকে বেঁধে না-রাখতে পারো তবে কি রাখবে সাক্ষী-সাবুদের জোরে ?

তা তো ঠিকই। যুক্তিতে কে পারবে রমেনের কাছে। তবু কেন যে মালতীদির মন কিন্তু-কিন্তু করে কে জানে। চুপচাপ জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকেন বাইরের লতাটার দিকে, জবাব দিতে পারেন না।

রমেন আবার ভার হ'য়ে ওঠে, থমথম করে, বলে 'আসল কথা আমার প্রেমে তোমার আস্থা নেই, তুমি আমাকে চাও না! চাও কতগুলো অনুষ্ঠানের আবর্জনা। ও সব আমি বিশ্বাস করি না।'

'না, না, বিশ্বাস অবিশ্বাসের তো কথা নয়—'

'তবে ?'

তবে যে কী সে কথা বুঝিয়ে বলতে পারেন না মালতীদি। মালতীদির বিপন্ন মুখের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে রমেন জোর গলায় বলে ওঠে—তবে আর কিছু নয় মালতী, বহুকালের বহুপুরুষের অশিক্ষার কুসংস্কার সব।

'কুসংস্কার !'

'তা ছাড়া আর একে কী বলে আমি তা জানি নে।

'কিন্তু—'

অসহিষ্ণু হ'য়ে ওঠে রমেন 'কিন্তু কিন্তু কিন্তু। উঃ। এতো লেখাপড়া শিখে তোমার কী লাভ হ'লো?'

'লেখা পড়া শিখলেই কি পূর্বপুরুষের সব নিয়ম মুছে ফেলা যায়?'

'যদি না-ই যায় তবে এ প্রহসন থাক, আমাকে বিদায় দাও।' রমেনের আশ্চর্য সুন্দর চোখ বেদনায় গভীর হ'য়ে ওঠে।

বিদায় দেবে? রমেনকে? মালতী? পায়রার মতো কেঁপে উঠলো বুক। তার চেয়ে দেহ থেকে তার প্রাণ চ'লে যাক না। পৃথিবী থেকে আলো মুছে যাক না। বিশ্বসংসারে মালতীর এমন আর কী আছে যার জন্য সে রমেনকে ছাড়তে পারে? তা ছাড়া রমেন তো ঠিকই বলেছে, তার শিক্ষিত মনও সায় দিলো রমেনের যুক্তিতে। সত্যিই তো, দু'জন যে দুজনকে ভালোবাসছি এটাই তো সবচেয়ে বড়ো কথা, বড়ো সম্পদ, সেখানে প্রহরী বসিয়ে লাভ কী? ভালোবাসা যদি কোনোদিন ফুরিয়েই যায় হৃদয় থেকে সামাজিক বন্ধনে কি তা আবার জোড়া লাগিয়ে দিতে পারবে? না তারা নিজেরাই সে জোড়াতালি-দেয়া জীবন নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে সংসারে? তবে আর কিসের সঙ্কোচ?

সারারাত ভেবে-ভেবে আরো কথা মনে হ'লো মালতীদির। বিয়ে করবো দু'জনে, মিলন হবে দু'জনের, মাথার উপর ঈশ্বর আছেন, বুকের মধ্যে আত্মা আছে, মনের মধ্যে আছে বিবেক। এই তো সবচেয়ে বড়ো কথা, বড়ো সাক্ষী। অতএব—

অতএব কোনো এক মধ্যবিত্ত পাড়ায় ছোটো একটি ঘরে এসে উঠলো তারা। খোলা জানলায় বাগান ঝুলালো, ভেতরে দুই দেয়ালে দুই খাট পেতে বিছানা করলো, কোণের দিকে পর্দা টাঙিয়ে সংসারের খুঁটিনাটি—জ্যাম জেলি রুটি মাখন, আপেল আঙুর।

খড়কুটোর মিষ্টি সংসার। পাখির নীড়। মাঝখানে কার্পেটের উপর গোল টেবিলে বইপত্রের স্তূপ। ছু'জনেই ছাত্র, ছু'জনেরই তো পড়াশুনো আছে।

৪

উদ্দাম বসন্ত নামলো জীবনে। রঙে রঙে ছেয়ে গেল লণ্ডন শহরের আকাশ বাতাস, প্রতিটি ধূলিকণাও সোনা হ'য়ে বিছিয়ে রইলো পায়ের তলায়। দিনগুলো যেন পাখীর পালক, হালকা হাওয়ায় ভেসে ভেসে যায়, সময়গুলো উড়াল দিয়ে কাটে।

স্টোভে ক'রে হাত পুড়িয়ে ছু'জনে মিলে রান্না, আধাসেদ্ধ ভাত চিবিয়ে স্বর্গসুখের অনুভূতি, একসঙ্গে থাকতে পারার পরিপূর্ণতা— সমস্তটা মিলিয়ে ভরপুর হ'য়ে রইলো হৃদয়। বান-ডাকা সুখের জোয়ার।

কোনো এক রাত্রিতে রমেন বললো, 'খাট ছুটো জুড়ে নাও না।'

চোখের জড়ানো ঘুম চকিত হ'লো মালতীর, চট ক'রে এপাশে ফিরে বললো, 'কেন ?'

'স্বামী-স্ত্রী কখনো আলাদা ঘুমোয় ?'

'স্বামী-স্ত্রী।'

'সন্দেহ আছে নাকি ?'

'সন্দেহ ?'

নতুন একটা দিক মুহূর্তে উন্মোচিত হ'য়ে উঠলো মালতীর কাছে। এ কথা তো সে ভাবেনি। স্বামী-স্ত্রী ? রমেন স্বামী ? সে

স্ত্রী? তাই তো। তারা তো স্বামী-স্ত্রীই। স্বামী-স্ত্রীরাই তো শুধু এভাবে থাকে। মালতী নিজেও তো এ সম্বন্ধটাই পাতাতে উৎসুক হয়েছিলো একসঙ্গে থাকার আগে। তবু যেন কী ভাবতে থাকে সে অন্ধকারে তাকিয়ে, কোথায় যেন খটকা লাগে তার মেয়ে-মনের চিরন্তন সংস্কারে। বিয়ের অনুষ্ঠান ছাড়া এতদূর এগিয়েও এই চৌকাঠটুকু সে ডিঙোতে পারে না। কে যেন তাকে সব কিছুর শেষে এই রাত্তিরে বিছানার চারপাশে গণ্ডি এঁকে রেখে দেয়।

রমেন বললো, 'জবাব দিলে না?'

ভয়ে-ভয়ে মালতী বলে, 'কিসের জবাব?'

'যা বললুম।'

'কী বাজে।' ভুরু কুঁচকে আবার ফিরে চোখ বোজে মালতী।

'বাজে বুঝি?'

মালতী চুপ।

কিন্তু দিন দুই পরে তার নিজেরই মনে দুর্বলতা আসে। বুজে থাকতে থাকতে ব্যথা হ'য়ে যায় চোখ, ঘুম আসে না। একবার পাশ ফেরে, একবার জল খায়, একবার তাকায় রমেনের খাটের দিকে, তারপর আস্তে কাঁপা-কাঁপা গলায় ডাকে, 'রমেন।'

'উঁ।'

'ঘুমুলে?'

'না।'

'কেন?'

'ভাবছি।'

'কী ভাবছো?'

'এ-বাড়ি ছাড়বো।'

'কেন, এর চেয়ে ভালো বাড়ির খোঁজ পেয়েছ নাকি ?'

'না।'

'তবে ?'

'তোমার সঙ্গে থাকবো না।'

'কী ?' ধ্বক ক'রে ওঠে মালতীর বুকটা।

'অন্তত রাত্তিরে এখানে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব।'

'কেন ?'

'তুমি দেবী হ'তে পারো, কিন্তু আমি মানুষ।'

এক মুহূর্তের অখণ্ড নিস্তব্ধতা। মালতীর যেন নিশ্বাস নিতেও ভয় হয়, মুখে-মুখে উচ্চারণ করে, 'আমিও তো মানুষ।'

'কিন্তু আমার রক্ত আছে, মাংস আছে, বৃত্তি প্রবৃত্তি সব আছে, আমার দেহ তোমার মতো পাথরের তৈরী নয়।'

'কোনো মানুষই কি পাথর দিয়ে তৈরি ?'

'আর কেউ কিনা জানি না', রমেন নিশ্বাস ফেললো, 'তোমাকে তো তা-ই মনে হয়।' আবার কয়েকটি দণ্ডপল ডুব দিল সমুদ্রের গভীর তলায়। পৃথিবীর নাড়ি যেন থেমে রইলো কয়েক পলকের জন্য। তারপর মালতী রুদ্ধশ্বাসে ফিসফিস করলো, 'আমি যা-ই হই না কেন, তুমি তোমার মতো ব্যবহার করলেই পারো।'

একটু চুপ ক'রে থেকে রমেন বললো, 'মানুষের মধ্যে যে জন্তুও বাস করে তা কি তুমি জানো ?'

'জানি।'

'তবে ?'

'মানুষের মধ্যে জন্তু থাকে ব'লে মানুষ তো আর জন্তু নয়।'

'মানে ?'

'মানে,'—ইতস্তত করলো মালতী, 'জন্তুর যেমন বিশেষ স্ত্রী-

পুরুষের মিলনই একমাত্র নয়, শরীর ছাড়া যেমন মন নেই, বিশেষ মানুষকে বিশেষভাবে গ্রহণ করবার অনুষ্ঠান নেই—'

আবার সেই সংস্কার। মাথা ঝাঁকিয়ে উঠলো রমেন, 'বুঝেছি। দোহাই তোমার, এই রাত ক'রে পাদ্রিসাহেবের মতো সার্মন দিও না। আমি ঠিক কাল চ'লে যাবো, দয়া ক'রে এই রাতটুকু ঘুমুতে দাও।'

'এতক্ষণ যখন ঘুমোওনি, তখন আর একটু জেগে আর-একটা কথা শোনো।'

'এখানে এসে বলো।'

'কেন, এখান থেকে বললে কি শুনতে পাবে না?'

'না।'

'তা হ'লে থাক।' মালতী পাশ ফেরে।

হঠাৎ ঝটপটিয়ে উঠে বসে রমেন, মুহূর্তে মালতীর বিছানার কাছে এসে দাঁড়ায়, দস্যুর মতো নিচু হ'য়ে দুই বলিষ্ঠ হাতে পাঁজাকোলা ক'রে তাকে নিজের বিছানায় নিয়ে আসতে আসতে বলে, 'ইশ! একটুকু তো একটা চড়ুই, তার বিক্রম কত ছাখো না।' চুমু খেয়ে বলে, 'ভেবে দেখেছি ভাগ্যেব কাছে হাত পেতে ব'সে থাকাটা নেহাত কাপুরুষের লক্ষণ, পুরুষকারই হচ্ছে আসল ধর্ম।'

মালতী একেবারে স্থির।

৫

রমেন বলেছিলো তার জীবনে এই মালতীদিই প্রথম মেয়ে যাকে তার জোর করতে হ'লো, যার জন্যে সাধনা করতে হ'লো, অপেক্ষা করতে হ'লো, বোকার মতো জিতেন্দ্রিয় হ'য়ে নষ্ট করতে হ'লো অনেকগুলো সময়। রমেন এ-ও বলেছিলো, এই একমুঠো

মানুষটার কাছেই জীবনে মাত্র একবার ঈষৎ পরাজিত বোধ করেছিলো সে। তার অভ্যাসবিরুদ্ধভাবে নৈ[illegible]ক শুদ্ধতার এই যে গতানুগতিক কতকগুলো ইডিয়টিক ব্যবহার সে করেছে কয়েকটা মাস, প্রকৃতপক্ষে সেইটাই তার চরম অধঃপতন। তা নৈলে আর কোনো মেয়ের সঙ্গে একবারের বেশি চোখে চোখ ফেলতে হয়নি তার, একবারের বেশি ঘাড় ফেরাতে হয়নি, একবারের বেশি—'

একবারের বেশি আরো যে কী কী করতে হয়নি তার তালিকা জানে মালতী। মালতী দেখেছে, রমেনকে নিয়ে মেয়েদের কাড়াকাড়ি, মারামারি, মান অভিমান, হ্যাংলামি। দেখেছে, সভ্যতা সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়ে পেছনে ছোটা। কলকাতাতেও দেখেছে, বিলেতেও দেখেছে। ওর দেবদুর্লভ চেহারাই ওর কাল, ওর বাপের কুবেরের ধনও হয়তো বা এর সঙ্গে যুক্ত। রমেন যে কী অসম্ভব সুন্দর মালতীদি তা ব্যাখা দিয়ে বোঝাতে পারেন না। কী যে আশ্চর্য তার কাজল-ডোবানো লম্বা চোখ, চোখের পল্লব, ভুরু, বাঁশির মতো নাক, বাদাম ছাঁদের মুখ, বাঁকা-ধনু ঠোঁট, নীলচে শিরা, দুধগোলাপ রং, সুঠাম শরীরের ঋজু ভঙ্গি—পুবাকালের অর্জুনই বোধহয় একালের রমেন হ'য়ে জন্মেছে। আর উলূপী, দ্রৌপদী, চিত্রাঙ্গদা, সুভদ্রারাও সঙ্গে-সঙ্গে জন্মান্তর নিয়ে রানী, বাণী, শ্যামলী, সুধীরা হ'য়ে তৎক্ষণাৎ পতঙ্গের মতো ঝাঁপ দিচ্ছে সেই আগুনে। নইলে এত প্রেম সে পেলো কী ক'রে? আর শেষ পর্যন্ত মালতীদি।

না তা নিয়ে কোনো আপসোস নেই মালতীদির। কোনো অনুতাপ নেই। নিজেকে দিতে পেরেই তিনি সুখী হয়েছিলেন, নিঃশেষে দেবার আনন্দেই কানায়-কানায় ভ'রে উঠেছিলেন। কী পেয়েছেন পাননি তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার হয়নি তাঁর। সেই

প্রথম রাত্রের আত্মনিবেদনই তাঁকে শরীরে মনে পদ্মের মতো বিকশিত ক'রে তুলেছিলো, মোমের মতো গ'লে গিয়ে ধন্য হয়েছিলেন তিনি। আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি যে সুখের কল্পনাও করতে পারেন নি, তারই নিবিড় উপলব্ধিতে সেই রাতে তার সমস্ত সত্তা স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিলো। রমেনের কল্লোলিত যৌবনাবেগ তাঁকে এক অপার্থিব আনন্দ-সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো। সে আনন্দে কূল নেই, তার বিস্তার আকাশের মতো, গভীরতা সমুদ্রের চেয়েও অতল।

সব মিলিয়ে তারা ছ'মাস একসঙ্গে ছিলো, তারপরই একদিন ডুব দিল রমেন।

দুই চোখে অন্ধকার দেখেছিলেন মালতীদি। প্রথমে দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, শেষে ভয়। হিম হ'য়ে জ'মে-যাওয়া একটা শক্ত ঠাণ্ডা ভয়। অনেক হাঁটলেন, খাটলেন, খুঁজলেন, খবর দিলেন পুলিশে, অনেক রাত কাটিয়ে দিলেন নির্ঘুম চোখের অশ্রুধারায় বালিশ ভিজিয়ে, কিন্তু কোথায় রমেন? আর পাত্তা নেই তার।

সেই সময়ে মালতীদির অত্যন্ত শরীর খারাপ ছিলো। সন্তান-সম্ভবা হয়েছিলেন তিনি। তিনি জানতেন না সন্তান যতই প্রণয়োৎপন্ন হোক না কেন, অবিবাহিত মায়ের সন্তান হওয়া সমাজে মস্ত পাপ। বিয়ে না-ক'রে কোনোমতেই স্বামী-স্ত্রীর অধিকার পাওয়া যায় না, আর স্বামী-স্ত্রী না হ'লে পিতামাতা হবারও কোনো প্রশ্ন ওঠে না সমাজে। অথচ যে-দু'জন বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষে একবিন্দু মনের মিল নেই, যাদের শিশুরা নেহাত পশুবৃত্তি চরিতার্থতার ফল, সে দু'জনের শিশুরাও সমাজের মাথার মণি, কিন্তু এই শিশু অবৈধ ব'লে পরিত্যাজ্য। আর শিশুর কুমারী মা?

ভাবতে পারেন না মালতীদি। এবার যে তাঁর কী হবে, কেমন ক'রে বাঁচবেন, কেমন ক'রে মুখ দেখাবেন, কোন্ অবস্থায় কাদের কূলে তাঁর নতুন গতি হবে সে সব কথা চিন্তায় এলেও তিনি শিউরে ওঠেন। এতদিনে এই প্রথম যেন তিনি দুই চোখ মেলে ভালোমন্দ মিশিয়ে দেখতে পেলেন সংসারটাকে। তাঁর সরল সহজ বুদ্ধি এই প্রথম একটা প্রচণ্ড আঘাতে মুহ্যমান হ'য়ে রইলো।

ঠিক তিন দিন এইভাবে কেটেছিলো, তারপর হঠাৎ এক সকালে আবার রমেন এসে হাজির। যেন কিছুই হয়নি এমনি তার ব্যবহার।

'কী হয়েছে? শুয়ে কেন? এতদিন পরে এলাম, চা'টা দাও।'

অদ্ভুত এক দৃষ্টি মেলে তার সহাস্য মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন মালতীদি। যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না দৃশ্যটা।

রমেন চুলে আদর বুলোলো, ক্লান্ত চোখে চুমু খেলো, তারপর খুব নরম গলায় বললো, 'ভাবছিলে বুঝি?'

মালতীদি তেমনিই তাকিয়ে থাকতে থাকতে উচ্চারণ করলেন, 'ভাববো না?'

'কেন, ভাবনার কী আছে?'

'নেই?'

'কত কাজ ক'রে এলাম।'

'কাজ?'

মালতীদির কেমন স্তম্ভিত ভাব, যেন বুঝতে পারছেন না কিছু, যেন ভাবতে পারছেন না মানুষটা আবার কেমন ক'রে ফিরে এলো। তার মুখের দিকে তাকিয়ে কষ্ট হয়তো বুঝলো রমেন। কিছু না ব'লে জানালায় তাকিয়ে হঠাৎ চুপ ক'রে গেল খানিকক্ষণের জন্য। একটা দীর্ঘশ্বাস কে আস্তে বয়ে যেতে দিলো বুকের গভীরে।

আস্তে-আস্তে দুপুরের শিউলির মতো একেবারে নেতিয়ে-পড়া একমুঠো মালতীদি উঠে বসলেন বাঁ হাতে ভর দিয়ে, কানের পাশে গড়িয়ে-যাওয়া চোখের জলের লম্বা রেখাটা চিকচিক ক'রে উঠলো, ডান হাতটা রমেনের কাছে বাড়িয়ে দিয়ে দুঃখে বেদনায় ভেঙে পড়লেন বুকের উপর, 'তুমি কেন চ'লে গিয়েছিলে এমন ক'রে? কোথায় গিয়েছিলে? কোথায় গিয়েছিলে তুমি আমাকে ফেলে?' রমেন বিষণ্ণ হেসে মাথায় হাত রাখলো, 'কী বোকা। টাকাকড়ির যোগাড় লাগে না? তার ব্যবস্থায় গিয়েছিলুম।'

'এমন না-ব'লে না-ক'য়ে?'

'তাতে কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে জিজ্ঞেস করছো?'

'একটু আত্মনির্ভর হ'তে শেখো মালতী। এমন তো হ'তে পারে বাকি জীবন একাই থাকতে হ'লো তোমাকে।'

'আমি ম'রে যাবো।' মালতীদি যে একটু ঝগড়াও করতে পারেন না রমেনের সঙ্গে। যেখানে তাঁর যথেষ্ট কঠিন হ'য়ে তিরস্কার করা উচিত ছিলো সেখানে তিনি শুধু কেঁদে ভাসালেন।

'ম'রে যাওয়া কি এতই সহজ, মালতী? দেখবে দিব্যি বেঁচে আছো। হয়তো বা আবার আর একজনকে ভালোবেসে মনে হচ্ছে—'

'ছি!'

গালে টোকা দিল রমেন, 'একদম ছেলেমানুষ।' তারপর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'শোনো, আজ একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে-টেয়ে নাও।'

ক-দিন খায়নি মালতী তা কি জানে রমেন?

আশ্চর্য! তা নিয়েও অভিমান করলেন না মালতীদি, রমেনের

কথামতো উঠে হেঁটে খাওয়ার ব্যবস্থায় মনোযোগী হলেন। নিজের জন্য নয়, রমেনের জন্য। রমেনের উপর কোনোমতেই তিনি রাগ করতে পারেন না।

৬

ঝিরঝির বৃষ্টি চলছিলো কদিন ধ'রে। আকাশের মুখ কালো স্লেটের মতো ল্যাপাপোঁছা ছিলো এ-কদিন। মালতীর মনের মতো অন্ধকারে নিরানন্দ হয়েছিলো এই শহরটা। আজ সুন্দর রোদ উঠলো। সবুজ আর হলুদে মেশা হাল্কা সোনালি রোদ।

আজ জানলা খুলে দিল মালতী, বিছানায় বাঁকা বেখায় কোন ফাঁক দিয়ে তারই একটি লম্বা ফালি এসে আলোকিত করলো ঘর। কদিন পরে কোণের পর্দা ঢাকা গৃহস্থালি ঝলসে উঠলো আবাব। ছোট্ট একটা উলের কোট গায়ে দিয়ে টুকটাক এটা-ওটা করতে লাগলো মালতী, স্টোভের মলিন দেহ ফ্লানেলের টুকরোয় মুছে নিয়ে স্পীরিট ঢেলে আগুন ধরালো। জল চাপিয়ে দিলো ছোট্ট প্যানে, আলু সেদ্ধ হ'লো, ডিম সেদ্ধ হ'লো, চায়ের জল ফুটলো। কোণে পড়ে থাকা পেয়ালা দুটি উত্তপ্ত হ'য়ে উঠলো চা পাতার টলটলে রসে। টোস্ট হ'লো, রমেন নিজেই একবাব বেরিয়ে গিয়ে ফল নিয়ে এলো কিছু তারপর, সেই রুটি মাখন কলা ডিম আলু দিয়ে সমাধা হ'লো দুপুরের আহার। সব সেরে তারপর একটু বিশ্রাম। বিশ্রাম নয় শান্তি।

রমেন পায়ের উপর কম্বল টেনে মাথার তলায় দুই হাত দিয়ে চিত হ'য়ে শুয়ে কী ভাবছিলো, মালতীকে পাশে অনুভব ক'রেই চকিত হ'য়ে উঠে বসলো, 'শুয়ে না, শুয়ো না, প্রস্তুত হ'য়ে নাও।'

'কিসের প্রস্তুত ?' মালতীদি অবাক্।

সে-সব বলবো তোমাকে, এখন প্রস্তুত হ'য়ে নাও। বেরুতে হবে।'

'কোথায় ?'

'হাসপাতালে।'

'হাসপাতালে!'

রমেন অসহিষ্ণু হ'য়ে জিব আর তালুতে ঠেকিয়ে বিরক্তিসূচক শব্দ করলো একটি, 'কথা বোলো না, সব ব্যবস্থা ক'রে এসেছি, এবার দয়া ক'রে চলো।'

'হাসপাতালে গিয়ে আমি কী করবো ?' এবার মালতীদিও একটু গোঁ ধরেন।

'কী আবার করবে। ডাক্তার দেখাবে।'

'হঠাৎ ডাক্তার দেখাবো কেন ?'

'হঠাৎ মানে ?'

'বলা নেই কওয়া নেই, কদ্দিন পরে এসে—'

'কী আশ্চর্য! এর মধ্যে তুমি এতো বলা কওয়ার দরকার দেখছো কোথায় ? তবে আমি করলাম কি এতোদিন ?'

'ডাক্তারের ব্যবস্থা।'

'হ্যাঁ।' ঈষৎ রাগ-মেশানো সংক্ষিপ্ত জবাব। পকেটে হাত ঢুকিয়ে রমেন পেছন ফিরে জানলায় গিয়ে দাঁড়ালো। ইতস্ততঃ করলো মালতীদি, তারপর একেবারে বুকের তলায় এসে মাথা নিচু করলো, 'হাসপাতালেব ডাক্তার কেন ?'

'হাসপাতালের ডাক্তারকেই আমাদের দরকার।'

'এখুনি ?'

'এখুনি!'

'তারপর ?'

'তারপর দেখিয়ে ফিরে আসবো।'

'ও, ফিরে আসবো ?' মালতীদির বুক থেকে যেন একটা ভয়ের বোঝা নামে।

ফিরে দাঁড়ালো রমেন। 'ফিরে আসবে না তো কি ওখানেই সংসার সাজিয়ে বসবে নাকি ?'

করুণ চোখে তাকিয়ে কী ভেবে মালতীদি হাসলো একটু। রমেনের গলায় মমতা ফুটে উঠলো, 'তুমি বড়ো ছেলেমানুষ মালতী। আর একটু শক্ত হও।' মাথার চুলে হাতে বিলে কেটে বললো, 'এবার তৈরী হ'য়ে নাও কেমন ?' হাত বাড়িয়ে সে কোটটা হ্যাঙ্গার থেকে টেনে নিল। বুকের সান্নিধ্য থেকে সরে এসে মালতীদি বললেন, 'আজ থাক।'

'না, না, ও আজই সারতে হবে।'

'সারাসারির কী আছে ? কাল যাবো।'

'বেশ কথা। এদিকে এ্যাপয়েন্টমেণ্ট ক'রে এসেছি না আমি ? এটা কি তোমাদের কুমিল্লা নোয়াখালি নাকি ? যখন খুশি আর যা খুশি করলেই হ'লো ?'

এরপরে মালতীদি আর কথা বাড়ায় না।'

শরীরের কষ্টে, মনের কষ্টে এ কয়দিনেই মুখখানা তার নিষ্প্রভ হ'য়ে গেছে। ভালো লাগে না। কিছু ভালো লাগে না। আয়নায় দাঁড়িয়ে কোনোমতে সামান্য প্রসাধনটুকু সেরে নিলেন, তারপর রমেনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে শাড়ি ছাড়তে আরম্ভ করলেন।

রমেন একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখতে-দেখতে বললো, 'আচ্ছা মালতী—'

'বলো।'

'ঠিক ক'মাস হ'লো তোমার ?'

মালতীদি লাল হ'য়ে উঠলেন, জবাব দিলেন না। রমেনের একটুও লজ্জা নেই কেন ?

'মাস তিনেকের বেশি না, না ?'

'কী যেন, অতশত জানিনে।'

'ষোলো বছরের মেয়ের মতো করছো কেন ?'

লজ্জার আবার বয়স আছে নাকি ? মালতীদি ভাবলেন। যে-কথা লজ্জার তা তো সব বয়সে সকলের কাছেই লজ্জার। আর এ ব্যাপারটায় তো মালতীর রীতিমতো খাটের তলায় ঢুকে যেতে ইচ্ছে করছে।

'ডাক্তার জিজ্ঞেস করলে ঠিকমতো বলতে পারবে তো ?'

ছুরির ফলার মতো তীক্ষ্ণ প্রশ্ন, যেন এতোটুকু আদ্রতা নেই কোথাও, নেই একটু সলজ্জ সপ্রেম লুকোচুরির মজা। প্রায় স্বভাব-বিরুদ্ধ ভাবেই অসহিষ্ণু হ'য়ে মালতী বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

পাতলা শাড়ির সিল্কের আঁচলটি কাঁধের উপর ফেলে দিয়ে শাড়ি পরা সমাপ্ত করলেন তিনি। তারপর জানলা বন্ধ করলেন, বিছানার ঢাকা টান করলেন, দরজায় চাবি লাগালেন, বেরিয়ে আসতে-আসতে প্রায় অপরাহ্ণ নামলো।

অপ্রসন্ন মুখে রমেন বললে, 'ইশ। কত দেরি ক'রে ফেললে।'

এতক্ষণে কান্নার বদলে মুখের ভাব থমথমে হয়ে উঠেছে মালতীদির। 'এতই যদি দেরির ভয় তবে নিজেই সকাল-সকাল এলে পারতে।'

'কত ঘুরেছি ক'দিন ভ'রে তা জানো ?'

'ইরেসপনসেব্‌ল্‌। ঘুরেছ সেটা কি আমার দোষ ?'

'তবে কার?'

'স্বভাব। সত্যি ক'রে বলো তো কোথায় ছিলে এ-ক'দিন?'

'তোমাকে লুকিয়ে আর কোথাও বাস করবার মতো অন্যায় জায়গা আমার আছে নাকি?'

ভারি আর মিষ্টি গলা রমেনের। মালতীদির রুক্ষ স্বর খাদে নেমে আসে হঠাৎ।

'নেই ব'লেই জানতাম। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'তোমার এই অদ্ভুত ব্যবহারের অর্থ আমি বুঝতে পারছিনে।'

'রাস্তায় বেরিয়ে আর কৈফিয়ত তলব কোরো না, আশা করি নিজে থেকেই বুঝতে পারবে সব।'

একটু চুপ ক'রে থেকে, অনেক সংকোচ কাটিয়ে মালতীদি বললেন, 'একটা সত্যি কথা বলবে?'

'কী?'

'এ-ব্যাপারটায় তুমি একটুও সুখী হওনি, না?'

'বাজে কথা।'

'বাজে কেন? অন্তত এই মুহূর্তে এটাই তো সবচেয়ে জরুরি ব'লে মনে হচ্ছে আমার।'

'তোমার জরুরি তালিকায় আর কী-কী পড়ে?'

'প্রথমেই—' থামলো মালতী। হাজার বার বলা কথা আরেক-বার বলতে দ্বিধা করলো, তারপর বললো, 'জানো তো অবিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর ছেলেমেয়ে—মানে—'

'বুঝেছি।' রমেন গম্ভীর।

'তাহ'লে নিজেদের জন্যে না হোক, ভবিষ্যৎ মানুষটির জন্যে নিশ্চয়ই একটা—'

'অনুষ্ঠান করা দরকার এই তো?' রমেন পাদপূরণ করলো, 'কিন্তু তার চেয়ে ভবিষ্যৎ মানুষগুলো না জন্মানোই কি ভালো নয়।'

'আহা, ভালো মন্দ যেন এখন নিজেদের মুঠোয়। যা হবার, তা তো হ'য়েই গেছে।'

কী বলতে যাচ্ছিলো রমেন, বাসে উঠতে-উঠতে হারিয়ে গেল সে-কথা।

এর পরে কতদূর যে যেতে হ'লো কে জানে। বাস থেকে নেমে টিউব, টিউব থেকে ট্যাক্সি—ব'সে থেকে, হেঁটে, [illegible] ব্যথা হ'য়ে গেল মালতীর। শহরে কি আর কোনো [illegible] হাসপাতাল ছিলো না? এ কোথায় কোন্ নির্জন প্রান্তরে রমেন নিয়ে এলো তাকে?

'অত্যন্ত সুন্দর ব্যবস্থা'—বোধ হয় মনের ভাবটা বুঝেই রমেন বললো, 'আরামে থাকবে।'

'থাকবো মানে?'

'থাকবে মানে—বাচ্চা জন্মাক আর না জন্মাক হাসপাতালে তো আসতে হবে তোমাকে?'

'আজকে তো আর নয়?'

'শেষ যেখানে হবে শুরুটাও তো সেখানেই করা দরকার। চেনা-পরিচয় হ'য়ে থাকবে, রোগী তাদের আপনার জন হয়ে উঠবে।'

'তিন দিন ধ'রে কি এই-ই খুঁজেছ?'

'এই-ই খুঁজেছি। সবচেয়ে যে ব্যবস্থা ভালো, যা ভালো, তার জন্যেই এই কদিনের কষ্ট আমার।'

বুক থেকে অভিমানের মেঘ স'রে গিয়ে মনের আকাশ হালকা

হ'লো মালতীর। একটু দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো কাজ করেছে বটে রমেন, কিন্তু মালতীর চিন্তাতেই তো সময় কাটিয়েছে। তার জন্যই তো এত কষ্ট করেছে।

ঘন সবুজ মাঠের মধ্যে নিতান্ত নির্জন নিরালা একটা রঙিন ফুলের বাগান ঘেরা ছোট্ট কটেজের গেটের মধ্যে ঢুকতে-ঢুকতে সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে রমেনের হাত জড়িয়ে ধরলো মালতী।

৭

এই নাকি হাসপাতাল? এমন ছোট্টো বাড়ি? এত অল্প লোক? তা হবে। হয়তো খুব দামি, তাই এমন একক ব্যবস্থা।

এক বুড়ী মেম এগিয়ে এলো সহাস্যে, হাতের দস্তানা দুটো প'রে নিতে-নিতে ভেতরে নিয়ে এলো তাদের। একটু দূরে গিয়ে কী জানি ফিসফিস করলো রমেনের সঙ্গে, টাকা নিলো মুঠো ভ'রে, তারপর বললো, 'আজকের রাতটা তো থাকতে হয়।'

'কেন? থাকবো কেন?' যেন এই ভয়টাই করছিলেন, এমন ভঙ্গিতে ভুরু কুঁচকে মালতীদি রমেনের দিকে তাকালেন।

সহজ গলায় রমেন বললো, 'হয়তো দরকার।'

'ডাক্তার দেখাতে এসেছি, দেখিয়ে চ'লে যাবো।' মালতীদি সোজা হ'য়ে দাঁড়ালেন, সোজা না বলে হয় তো শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন বলা উচিত। 'তাছাড়া এমন নয় যে হঠাৎ এসেছি, তুমি তো এঁদের ব'লেই গিয়েছিলে—'

'দেরি হ'য়ে গেছে বোধ হয়।'

মালতী সবেগে মাথা নাড়লো, 'না, না, থাকবো না আমি। আমার ভালো লাগছে না।'

চাপা গলায় তিরস্কার করলো রমেন, 'সবটাতেই ছেলেমানুষি কোরোনাতো, মানায় না।'

কী মানায় আর মানায় না তার বিচারবুদ্ধি রমেনের আসতে পারে, কিন্তু মালতীতো সেই মালতীই ? দু' পা সরে এলো সে, ঢোক গিলে বললো, 'আমি কিছুতেই আসবো না।'

'এঁরা ডাক্তার, তুমি রোগী, এখানে এঁদের কথাই চূড়ান্ত।'

'রোগী বলে আমার ইচ্ছের কোনো দাম নেই তাতো হ'তে পারে না ? ডাক্তার দেখাতে এসে থেকে যেতে হয় এমন অদ্ভুত কথা আমি কোনোদিন শুনিনি।'

'এ ঘটনা কি তোমার জীবনে আর ঘটেছে ? এ অবস্থায় কী করা উচিত বা বা দবকার সেটাতো জানবার কথা নয় তোমার। প্রথমবার যথেষ্ট যত্ন নিতে হয়, অনেক কিছু ভাবতে হয়, অনেক বেশী সাবধান থাকতে হয়।'

'থাক, এঁদের কাছে আর যত্ন নিয়ে কাজ নেই আমার। মোট-মাট রাত্তিরে থাকবো না আমি।'

'কেন ?'

"না, না, আমার ভয় করে।'

'এই ছ্যাখো, ভয় কী ? রমেনের গলা কোমল হ'য়ে এলো, 'আমি তো আছি।'

'তুমিও থাকবে ?'

'থাকবো না তো তোমাকে একা রেখে যাবো নাকি ?'

এবার একটু ভাবলো মালতী, একটু ইতস্তত করলো।

রমেন বললো, 'সুন্দর জায়গা, আমার তো এমনিতেই লোভ হচ্ছে থাকতে।'

'দু'জনকে আসতে দেবে ওরা ?'

'নিশ্চয়ই দেবে।'

'যদি না দেয়।'

'তা এ'লে দু'জনেই চলে যাবো।'

'ও।'

রমেন পিঠে হাত রাখলো, মৃদুহাস্যে বললো, 'পাগলী।' কম্পাউণ্ডের চারদিকে তাকিয়ে বললো, 'ভীষণ ভাল লাগছে জায়টা। একটা ঘরের খাঁচা থেকে আকাশের বাসা।'

ভারি মুখে 'মালতী বললে, 'এতো যদি ভালো লাগে তাহ'লে গ্রামে থাকলেই হয়।'

'তা-ই থাকবো!' রমেন মালতীর সঙ্গে কথা রেখে পাশের অফিসরুমে গিয়ে ঢুকলো, কিন্তু বেরিয়ে এলো তক্ষুনি। বললো, 'এসো।'

সুন্দর ঘব। সাজান-গুছোনো। নরম বিছানাব আদর যেন হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। মেইড এসে চা দিয়ে গেল দু'জনকে। ডাক্তার এসে নাড়ি টিপে দেখলেন, ইনজেকশন দিলেন দু'বার। বুড়ী মেম গল্প ক'বে গেল একচোট। একজন নার্স এসে ওষুধ খাইয়ে গেল একবার। সমস্ত পবিপাটি, সমস্ত নিখুঁত। রাত্তিরের খাওয়ারও এতটুকু নিন্দে করতে পারলো না মালতী।

'ইনজেকশন দিলো কেন?' ঘুমুতে-ঘুমুতে রমেনের গায়ে নিজের শিথিল হাতখানা বিছিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলো মালতী। রমেন বললো, 'তুমি ভারি দুর্বল।'

'রোজই দেবে নাকি?'

'তা'কী জানি? দরকার হ'লে দিতে পারে।'

'রোজ আমাকে পাবে কোথায়?'

'পাবার দরকার কী ? ইনজেকশন দিতে হ'লে কি শহরে আর কোনো ডাক্তার নেই ? এরা প্রেসকৃপশন ক'রে দেবে।'

'তাই তো।' পরম নির্ভয়ে অনেকদিন পর অত্যন্ত নিরুদ্বেগে ঘুমিয়ে পড়লো মালতী। আর ঘুম ভাঙলো একেবারে সকাল সাতটায়। রমেন উঠে ব'সে দাড়ি কামাচ্ছে, জানলার কাচে পিছলে পড়ছে সূর্যের আলো, ফুলের গাছগুলো আন্দোলিত হচ্ছে হাওয়াতে, মালতী উঠে বসলো গা থেকে কম্বল সরিয়ে।

'ঘুম হ'লো ?' মুখ না-ফিরিয়েই বললো রমেন।

'তুমি এত সকালে ?' মালতী ওদেরই দেয়া ড্রেসিং গাউনটা গায়ে জড়িয়ে বিছানা থেকে নেমে পায়ে স্যাণ্ডেল গলালো।

'নিজের বাড়ি নয় সে-খেয়ালটা ছিলো, তাই ঘুম ভেঙে গেল। মুখ ধুয়ে এসো, এবই মধ্যে বুড়ী এসে উঁকি মেরে গেছে দুবার। ডাক্তার ন'টার মধ্যে আসবেন।'

মালতী তাড়াতাড়ি ঢুকলো বাথরুমে। বেরিয়ে এসে দেখলো ব্রেকফাস্ট দেয়া হ'য়ে গেছে।

ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় নটার সময়েই ডাক পড়লো মালতীর। পরীক্ষার জন্য তোলা হ'লো তাকে লম্বা টেবিলে। টুপি-পরা লাল-মুখ দুজন নার্স দাঁড়িয়ে রইলো দু'পাশে, ডাক্তার এপ্রনের ফিতে বাঁধতে-বাঁধতে কাছে এগিয়ে এলেন।

চুপচাপ। থমথম। বুকটা ঢিপঢিপ করলো মালতীর। কী জানি কেন।

মালতী জানতো না ডাক্তাররা মানুষকে কেমন ক'রে অজ্ঞান করে। যিনি বড়ো ডাক্তার তিনি তাকে দেখলেন ভালো ক'রে, ছোটো ডাক্তার তাঁর ইঙ্গিতে আবার ইনজেকশন দিলেন। তারপর

মুখের উপর খপ্‌ ক'রে কী যেন পরিয়ে দিলেন একটা। তখন জানতেন না মালতীদি যে ওটার নাম গ্যাস্‌-মাস্ক। পরে জেনে-ছিলেন। অবাক হ'য়ে ভয় পেয়ে ছটফট ক'রে উঠলেন তিনি। যতটা তার মনে পড়ে প্রাণপণে চিৎকার করেছিলেন বাঁচাও বাঁচাও ব'লে, তারপরই গভীর ঘুমে ছেয়ে এলো শরীর। সুখের ঘুম। নিঃ-সাড়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

স্বপ্ন দেখেছিলেন একটা। কী স্বপ্ন মনে নেই স্পষ্ট, কিন্তু ভাবতে মন আকুল হ'য়ে ওঠে। একটা অদ্ভুত অনুভূতির শিহরণ ব'য়ে যায়। তাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, ছাড়া-ছাড়া, ভাসা-ভাসা। মস্ত এক সরোবর, তার জল গভীর নীল, অসংখ্য পদ্ম। পদ্মের মৃণালগুলো হঠাৎ সহস্র বাহু হ'য়ে তাকে ডাকলো, আর সেই হাতছানির আকর্ষণে সমস্ত পৃথিবী এগিয়ে এলো কাছে। আকাশ নেমে এলো, আকাশের পাখিরা পাখা মুড়ে টুপ ক'রে ডুব দিল জলে, আর সেই ডুবে যাওয়ার শব্দ থেকে সৃষ্টি হ'লো এক সুরতরঙ্গ। সেই তরঙ্গ অন্ধ ভ্রমরের মতো গুনগুন আওয়াজে বাতাসে ভাসতে লাগলো ঢেউয়ের মতো কেঁপে-কেঁপে। তাবপর মিশে গেল কোথায়।

এই অপূর্ব, ঐশ্বরিক অভিজ্ঞানেব জন্য মালতীদি সত্যিই কৃতজ্ঞ বোধ করেছিলেন রমেনের উপর। রমেনই তো একমাত্র মানুষ, যে তাকে এই সুষমায় নিয়ে যে পারে, এমন স্বপ্ন দেখাতে পারে।

৮

যখন চোখ মেলে তাকালেন সূর্যে ঝিম ধরেছে। মধ্যাহ্নের আবেশে কেবল স্থির, অচঞ্চল, অবিকৃত একটা প্রচণ্ড তাপ। এই সময়ে সমস্ত জ্যোতি নিয়ে, আগুন নিয়ে সূর্যদেব ঘুমোন একটু,

তারপরই অপরাহ্ণ নামে, তিনি পাশ ফেরেন। তারপর পাটে যাবার আগে মেজাজ ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে তাঁর, সন্ধিক্ষণ আসে, তিনি মিলিত হন রাত্রির সঙ্গে।

মালতীদির শরীরেও ঝিম ছিলো তখন, চোখ চেয়ে তাকালেও ঘুমের ঘোর ছিলো, বুদ্ধি বোবা ছিলো। রমেনকেই দেখেছিলেন তিনি, মুখের উপর ঝুঁকে আছে। 'কী! কী! কেমন আছ?'

মালতীদি ঠোঁট নেড়েছিলেন, কথা ফোটেনি। সেই ঘোর কাটতে সময় লেগেছিলো তাঁর। সেই রাতটাও সেই কষ্টেই কাটিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ জেগে উঠতে-উঠতে পরের দিন আবার মধ্যাহ্ন।

'ব্যাপার কী বলো তো?' অবাক্‌ হ'য়ে রমেনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি, 'আমাকে ওরা অজ্ঞান ক'রে নিল কেন?'

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে রমেন বললো, 'ইনটারনেল পরীক্ষার আজকাল এ-ই আধুনিকতম পদ্ধতি।'

রমেন সিগারেট খায় না বেশি। বেশি কেন, প্রায় 'না'র মধ্যেই ধরা যায়। নেশার ধাত নেই তার। পান করতেও পটু নয়। খুব ভালো কিছু না হ'লে সেদিকে তাকায় না। মনের বিশেষ কোনো অবস্থায় প্রতীক তার এই সব।

মালতী বললো, 'বাজে কথা।'

'বাজে কি কাজের দু'চারদিন বাদেই বুঝবে।'

মনে মনে সন্দেহ হচ্ছে মালতীর, চোখে চোখ রেখে সে স্থির রইলো। রমেন দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে জানলায় গিয়ে দাঁড়ালো। ফিরলো একটু পরেই। 'এবার তাহ'লে যাবার ব্যবস্থা করি, কী বলো?'

'সত্যি ক'রে বলো তো আমাকে কী করা হ'লো?'

'কী আবার।'

'এই বুড়ী এখানে, শহর থেকে বাইরে, এতদূরে কিসের হাস-পাতাল পেতে বসেছে?'

'বলছো কী তুমি?'

'জিজ্ঞেস করছি আমাকে এখানে এনে এদের দিয়ে তুমি কী করালে?'

একটু চুপ ক'রে থেকে রমেন বললো, 'যা ভালো—'

'রমেন, বলো, সত্য কথা বলো।'

মালতীর মুখোমুখি দাঁড়ালো রমেন, মাথার উপর আস্তে হাত রেখে তার চেয়েও আস্তে বললো, 'তোমাকে অব্যাহতি দিলাম।'

'অব্যাহতি!'

'হ্যাঁ, মালতী।'

'কী থেকে তুমি আমাকে অব্যাহতি দিলে?'

'বন্ধন থেকে।'

'আমার সব বন্ধন তো তুমিই,তুমি ছাড়া আর আমার কী আছে?'

'তা হ'লে তা-ই।'

'তা-ই? বলতে পারলে এ-কথা? তবে আমার কী থাকলো?'

'সব। যেমন ছিলে, আবার তেমনি হ'লে।'

দুর্বল মাথায় রমেনের কথা ঝাপসা লাগে মালতীর, ছটফট ক'রে ওঠে, কী যেন বুঝে-বুঝেও বোঝে না।

রমেন আদর করলো, 'আর কথা না, লক্ষ্মীটি। একটু চুপচাপ থাকো, আমি যাবার বন্দোবস্ত করি।' মালতী চুপ ক'রে চোখ বুজলো, তার শক্তি ছিল না।

সম্পূর্ণটা রাস্তা ট্যাক্সি ক'রেই ফিরতে হ'লো। মালতীর এই শরীরে উপায় ছিলো না তাছাড়া। খরচ হ'লো যথেষ্ট। কী আর

করা, খরচের পাল্লাতেই পড়েছে রমেন। তা যা-ই হোক টাকার তার অভাব নেই, টাকার বিনিময়ে যে এত বড়ো একটা দায় থেকে সে মুক্তি পেলো মনে মনে বোধহয় তারজন্যেই শত শতবার ধন্যবাদ দিলো ঈশ্বরকে। কিংবা বিজ্ঞানকে।

বাড়ি ফিরে কিন্তু মালতীদি আর একটিও কথা বললেন না রমেনের সঙ্গে, রমেনও তাই নিয়ে কিছু ব্যস্ত করলো না নিজেকে, বরং এড়িয়ে চলতে পেরেই যেন বাঁচলো। একটা চাপা দম-বন্ধ-করা গুমোট হাওয়া। আবার মাঝখানের টেবিলের হু'পাশের খাটে হু'জনের বিছানা পড়লো নতুন ক'রে। তারপর অল্প কয়েক-দিনের মধ্যেই সম্বন্ধ ক্ষীণ হ'য়ে এলো। সন্তান উৎপাটনের কারণটা বুঝেছিলেন মালতীদি। বুঝেছিলেন, রমেনের ধাতই এই নয় যে একটা মানুষের সঙ্গেই সে আবদ্ধ হ'য়ে থাকতে পারে সারাজীবন। ছোটো জলার ব্যাং নাকি সে? তার প্রেমের বিস্তার যে আকাশের চেয়েও বিশাল। স্ত্রী পুত্র নিয়ে ঘ্যানঘ্যান প্যানপ্যান অসহ্য তার পক্ষে। নিত্য নতুন মেয়ের প্রেমে সে ভেসে বেড়াতে চায় অবাধ স্রোতে। বিয়েব বন্ধনেও তার অনীহার এই একমাত্র কারণ। স্বামী হ'তেই যার এতো আপত্তি সে আর পিতা হবে কেমন ক'রে।

তবে আর কেন?

এর পরে মালতীদি নিজে থেকেই স'রে গেলেন একদিন।

৯

এত সব কথা মালতীদি নিজে আমাকে বলেননি, বলেছিলো মঞ্জুশ্রী। মঞ্জু আরো বলেছিলো, রমেনকে নাকি সে নিজেও দেখেছে। সত্যি বলতে কী, কোন এক সময়ে কলকাতায় তিনমাসের বসবাসে

রমেনকে দেখে তারও মূর্ছা যাবার দশা হয়েছিলো। এমনও হয়েছিলো যে মনে-মনে এই লোকটিকে নিয়ে খেলা করতেই তার বেশ ভালো লাগতো। অমন সুন্দর রমেন যে মালতীদির সঙ্গে এমন একটা বিশ্বাসহন্তার পার্ট করেছে ভাবতেই অবাক লাগে। আর করেছে কিনা তা-ই বা কে জানে। লেখাপড়া শিখলে কী হবে, মালতীদিটা একটা বোকা। কেন রে বাপু, না-হয় বাচ্চা না-ই হ'তো, পছন্দ যখন করে না। তাই ব'লে অত মান দেখিয়ে চ'লে আসবার দরকারটা কী?

সঙ্গে-সঙ্গে এইসব বলেছিলো মঞ্জুশ্রী।

এক শাঁখার গল্প শুনতে গিয়ে এতো। অথচ এ-সবের ফাঁকে শাঁখাটা কবে আর কখন যে রমেন মালতীদিকে পরিয়েছিলো তা-ই আর জানা হ'লো না।

অনেক বর্ষার দিনে আমি আর মালতীদি একসঙ্গে ভিজেছি, অনেক গরমের রাতে আমি আর মালতীদি সারারাত পাশাপাশি ছাতে শুয়ে গল্প করেছি, চৈত্রের পাতা-ঝরা সন্ধ্যার উতলা হাওয়ায় কবিতা পড়েছি একসঙ্গে, শীতের দিনের কত রোদ্দুর-জ্বলা উত্তপ্ত সকালে রমনার মাঠে হেঁটে বেড়িয়েছি—গান করেছি, চুপ ক'রে থেকেছি, উদ্দাম তর্কে ঘর ভ'রে দিয়েছি, সব—সব আমার মালতীদির সঙ্গে। আমার সেই বয়েসটা আর সেই সময়টা শুধু মালতীদিতেই রঙিন। আমার আটাশ বছর বয়সের বন্ধু, আমার গুরু, আদর্শ, আমার পরম আত্মীয়। আমার সোনামোড়া দিনগুলোর একমাত্র সঙ্গী। মালতী-দিকে ভালোবেসে আমি ভালোবাসার গভীরতা জেনেছিলুম, পবিত্রতা জেনেছিলুম, আমি তাঁকে ঈশ্বরের মতো ভালোবাসতুম, আমার চোখে মালতীদির চাইতে সুন্দর আর ভালো আর মধুর কী ছিলো তখন?

ঢাকাতে চাকরি নিয়ে এসেছিলেন তিনি। ইডেন কলেজের প্রোফেসরি। মাত্রই বছরখানেক ছিলেন। তারপর মন ঘুরলো তাঁর।

আলাদা ছোট্ট একটা বাড়ি নিয়ে ছিলেন পুরানা পল্টনে। সামনে বাখারির বেড়া-দেয়া বাগান ছিলো একটুখানি, বাগানে প্রজাপতি উড়তো, পাড়ার ছেলেরা ছুটে আসতো ফড়িং ধরতে, মালতীদির বুড়ী দাই খিটি-মিটি করতো, মালতীদি সকৌতুকে হাসতেন, লজেন্স আর আবেদের বিস্কুট এনে রাখতেন মুঠো ভ'রে দেবার জন্য, পুষ্যির সংখ্যা প্রতিদিন বাড়তো। বিকেলে তাদের লুকোচুরি খেলা হ'তো আর সন্ধ্যার অন্ধকার ছেয়ে যখন রাত নামতো, গেটের মাধবীলতাব ঝোপে জোনাকি জ্বলতো তখন। দক্ষিণের খোলা বারান্দায়, বেতের চেয়ারে টেবিলে ব'সে ব'সে তিনি কাজ করতেন, অবসর সময়ে ডেক-চেয়ারে এলিয়ে বিশ্রাম করতে-করতে বই পড়তেন, আর আমাকে দেখলে আলো হয়ে উঠতো মুখ। সেই বুড় দাই ব'সে-ব'সে তকলি কাটতো আর গল্প করতো। একবার মহাত্মাজিকে দেখেছিলো সে, সেই এক গল্প একশোবার।

এতো শান্তি, এতো সুন্দর পরিবেশ, এমন নিরবিলি নিঝ[illegible]ট চাকরী, তবু মালতীদির কিন্তু মন টিঁকলো না। মঞ্জু বললো, 'টিঁকবে কী? মালতীদির কি কোনো লজ্জা আছে? আবার যে রমেনের সঙ্গে পত্রালাপ চলছিলো।'

'তাই নাকি?' কৌতূহলী হ'য়ে উঠেছিলাম, খুশিও। ভালোই তো। যাকে এতো ভালোবাসেন মালতীদি, এতো কিছুর পরেও যার দেয়া শাঁখার বাঁধনটি তিনি কিছুতেই খুলে ফেলতে পারেননি, তার সঙ্গে যদি আবার ওঁর একটা মিটমাট হ'য়ে পুনর্মিলন ঘ'টে যায়—

'এদিকে ছাখ,' মঞ্জু মুখর হ'য়ে ওঠে বিরক্তিতে, 'ওর জন্তেই তো মালতীদির এত কষ্ট ? বিলেতের দিনগুলো শেষে যে কী সাংঘাতিক হ'য়ে উঠেছিলো তা তো জানিস না ? কী লজ্জা, কী লজ্জা। ঘটনাটা সবাই জেনে ফেলেছিলো কিনা। কোন বাঙালী ছেলেমেয়েরা তো মিশতোই না, ওঁর সঙ্গে দেখলে ফিক ক'রে হাসতো, কানাকানি করতো, গা টিপতো, এমন কি বাঙালী ছাড়াও ভারতীয় অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা--'

'ভীষণ অন্যায়!' রেগে উঠে বললুম, 'এসব ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়েও যদি ঘোঁট পাকাবে তবে কূপমণ্ডূপগুলো বিদেশে গিয়েছিলো কেন?'

'তা কী করবি?' মঞ্জুশ্রী চোখ টান করলো, 'তোর না হয় অতি প্রিয় মালতীদি, তাই ব'লে সবার তো আর নয়? সবাই ক্ষমা করবে কেন এই অন্যায়?'

'কী অন্যায়?'

'কী না? একটা ছাত্রী, পড়তে গেছে কত কষ্ট ক'রে, পড়াশুনো করো। তা নয়, প্রেম। আর প্রেমও কি যেমন তেমন? বাচ্চা হবার দরকার ছিলো কী?'

'বা রে। বাচ্চা হবে না?'

'কেন হবে? ওরা কি বিয়ে করেছিলো?'

'ভালো তো বেসেছিলো!'

'ভালোবাসলেই হ'লো?'

'তবে আবার কী? ভালোবাসে ব'লেই তো তাদের ছেলেমেয়ে হয়!'

'ক্যাবলামি করিস না। মালতীদি কুমারী ছিলেন না!'

'আহা, কুমারী আবার কোথায়? একসঙ্গে তো ছিলেন!'

'সেটাই তো যথেষ্ট অন্যায় হয়েছিলো।'

'সাক্ষীসাবুদের কথা তো হচ্ছে না, আইনের কথাও নয়, যারা দু'জন দু'জনকে অত ভালোবাসে সেখানে তাদের বাচ্চা হবেই। এখন রমেন একটা স্কাউনড্রেল, তাই—'

'তা অবশ্য বলতে পারিস।' মঞ্জুশ্রী কী জানি কী ভেবে গলার স্বর নামালো, সহানুভূতির সুরে বললো, 'মালতীদির নেহাতই মনের জোর ছিলো, তা নৈলে ঐ কষ্টকে জয় ক'রে ঐ দুর্নামকে তুচ্ছ ক'রে ঠিকঠাক ফিরে তো এলো? অবিশ্যি বাপ-মাকে সর্বস্বান্ত ক'রে ছেড়েছে, ডিগ্রিটাও পায়নি। রাধামোহন-কাকার অমন অকস্মাৎ মৃত্যুর কারণই তো মালতীদি।'

'মালতীদির বাবা মারা গেছেন?'

'কবেই তো। কিন্তু কী ভালোই বাসতেন মেয়েকে।'

'এখন বুঝি আবার রমেনের জন্যই কলকাতা গেলেন?'

'তা ছাড়া আবার কী?'

'কই, আমাকে তো বলেননি।'

'আমাকেই কি বলেছেন? আমি আন্দাজেই বুঝেছি। কী সুন্দর বাড়িটা ছিলো, কী শান্তিতে ছিলেন। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।'

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

মঞ্জু বললো, 'কৈফিয়ত অবিশ্যি দিয়েছেন একটা। এর চেয়েও নাকি ভালো চাকরি পেয়েছেন তাই যাচ্ছেন। ইনশিওরেন্স কোম্পানিতে। ভেবে ছাখ, মালতীদির মতো মেয়ে কাজ করবেন ইনশিওরেন্সে। কী বুদ্ধি, কী যুক্তি।'

আমিও ভাবলাম সে-কথা। মালতীদির মতো ছোট্টোখাট্টো একটুখানি একটা মানুষ, আর যা ভালোমানুষ, তিনি কী করবেন ওসব চাকরির ঝামেলায় গিয়ে।

বললুম, 'ওঁর পক্ষে কলেজের কাজই সবচেয়ে যোগ্য ছিলো। লিখতেন টিখতেন—'

'আর লেখা! রমেনই ওর মহাকাল।'

'রমেনের সঙ্গে আবার নতুন ক'রে পত্রালাপ আরম্ভ হ'লো কী ক'রে?'

'ভগবান জানেন। শেষের দিকে তো দেখেছি দিনরাতই চিঠি লেখার পালা। রমেনও লিখতো, মালতীদিও লিখতেন।'

'কই, আমি তো কখনো—'

'তুই কী জানবি!' বাধা দিল মঞ্জুশ্রী, 'দাইটা দেশে গেল পরে আমি ছিলুম না কদিন? তখন দেখেছি রোজ চিঠি আসছে মালতী-দির নামে, আর ঘুম থেকে উঠে চা খেয়েই তার জবাব লিখতে বসেছেন মালতীদি।'

'তা যে রমেনেরই চিঠি সেটা তো আর জানিস না?'

'কেন জানবো না? জিজ্ঞেস করেছি না? মালতীদি নিজে বলেছেন রমেনের চিঠি।'

মনটা হঠাৎ খারাপ হ'য়ে গেল। এতো ভালোবাসা, এতো বন্ধুতা, সারাদিন এতো একসঙ্গে থাকার ঘটা, অথচ আমাকে বলেননি এতো বড়ো খবরটি? আমি এতোই পর? এতোই দূর?

কলকাতা গিয়েও মালতীদি নিয়মিত চিঠি লিখছিলেন আমাকে, আমিও ঠিকমতো জবাব দিচ্ছিলুম, এর পরে সেটা কয়েক ফোঁটা চোখের জলে সমাপ্ত হ'লো। আমি অভিমান ক'রে বন্ধ ক'রে দিলুম জবাব দেয়া।

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ হেমন্ত—আস্তে আস্তে চাকায় ঘুরে ঘুরে কত-বার ক'রে পার হ'লো কত ঋতু। মালতীদির বিচ্ছেদের বেদনার উপর আস্তে-আস্তে এক পুরু পল্লা বিস্মৃতির পলিমাটি পড়তে লাগলো। দেখতে-দেখতে পুরু হ'য়ে উঠলো সে-আস্তরণ। আমাদের চিঠি-লেখালেখি ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে ডুবে গেল একদিন, ভুলে গেলুম সব কথা, এমনকি তাঁর ঠিকানাও হারিয়ে গেল কবে। আর তারপর প্রায় ছ'বছর পরে আবার আমার সঙ্গে দেখা হ'লো মালতীদির।

ততদিনে জীবনের পরিবর্তন হ'য়ে গেছে অনেক, অনেক বয়স বেড়েছে, অনেক দায়িত্বও। স্ত্রী হয়েছি, মা হ'য়েছি, ঢাকা ছেড়ে কলকাতায় স্থায়ী বাসিন্দা হ'য়েছি, আরো কত কী। গোয়ালন্দতে বেড়াতে এসেছিলুম পুজোর ছুটিতে, সঙ্গে লোকজন নিয়ে এসেছি, সুন্দর একটি বাড়ি পেয়েছি, আর সারাদিন ঘুরে বেড়াচ্ছি কাজে অকাজে। এরই মধ্যে কোনো এক পরিচিত বাড়িতে বিকেলের চায়ের নিমন্ত্রণে গিয়ে দেখি মালতীদি। আমি অবাক্। ঠিক তেমনি করমচা ছাঁদের চোখে মিষ্টি হাসি, তেমনি চিনেদের মতো হলদেটে গায়ের রং, তেমনি ছেলেমানুষ চেহারা। এলোমেলো ঘন চুলে মাথা ঝাঁকালেন, তারপর দু'হাত বাড়িয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। আর জড়িয়ে ধরার প্রবল আকর্ষণে বুঝলাম আমাকে তিনি ভোলেননি। চোখে জল এসে গেল।

'ভালো আছিস্?'

অভিমান ক'রে বললুম, 'জেনে দরকার আছে কিছু?'

'নেই বুঝি? সব জানি। বিয়ে করেছিস তা জানি, মেয়ে

হয়েছে তা জানি, মেয়ের নাম মালতী রেখেছিস তা-ও জানি। কিন্তু মালতী রেখেছিস কেন রে?'

'মালতী তো নয়, মধুমালতী।'

'ঐ হয়েছে। প্রথমে ওরকমই মধুটধু একটা থাকে, শেষে মালতীতেই মিশে যায়।'

'মালতীতেই মিশুক, বোধ হয় তাই চেয়েছি।'

'তাই চেয়েছিস?' একটা নিশ্বাস ছাড়লেন মালতীদি, 'তবে তুই দেখছি আমাকে একেবারে ভুলে যাস্‌নি।'

'পাছে ভুলে যাই সেজন্যেই নামটা জপ করছি মেয়েকে ডেকে-ডেকে।' আমি হাসলাম। মাতীদিও হাসলেন।

'ভুলে গেলে হাজার বার উচ্চারণেও আর সেই সুর ফোটে না, তা বুঝি জানিস না?'

এবার স্বীকার করলাম কন্যার নামকরণের ভারটা ঠিক আমার উপরে ছিলো না। ওটা ওর বাবারই ফেভরিট নাম। আমার নাম মণিমালা, অতএব মেয়ের নাম মধুমালতী। দুটো ম, শুনতে নাকি ভীষণ মিষ্টি।

'তাই বল।' মালতীদি আদর ক'রে কাছে বসালেন, সব পরিবেশ ভুলে (যা তাঁর স্বভাব) একাগ্র হ'য়ে উঠলেন আমাকে নিয়ে।

আশ্চর্য। এতোদিন এতো কিছুর পরেও দু'চার দিনের মধ্যে আবার আমরা তেমনই ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠলাম। মালতীদিকে ধ'রে নিয়ে এলাম নিজের বাড়ীতে, স্বামীকে লিখলাম, 'তুমি চ'লে যাবার পরে ভেবেছিলাম অধিক স্বাস্থ্য সঞ্চয়ে আর আমার কর্ম নেই, তোমারই যখন পুরো একটা মাস থাকার ছুটি জুটলো না তখন সেই

ছুটি আর ঠাকুর চাকর নিয়ে আমি ভোগ করি কোন্ লজ্জায়। পাত্তাড়ি গুটোবার চেষ্টা করছিলুম। এমন সময় মালতীদির সঙ্গে দেখা। ঠিক সেই মালতীদি। আর মালতীদির সঙ্গে আমার ইতিহাস তোমার অবিদিত নেই। সবচেয়ে যেটা অবাক্-করা কথা, সেটা হচ্ছে মালতীদিকে আমার ঠিক তেমনি ভালো লাগছে। তাই ভাবছি বাড়িটা যখন আগাম ভাড়া নেয়াই গেছে একবার, রেল কোম্পানিকে অতগুলো টাকা দিয়ে যখন একবার এসেই পড়েছি এতোগুলো লোক, তখন না-হয় থেকেই যাই পুরো সময়টা।

উশ্রীর ধারে বেড়াতে-বেড়াতে একদিন বললুম, 'আবার আপনি রমেন সেনের জন্য কলকাতা এসেছিলেন?'

চোখ বাঁকিয়ে মালতীদি বললেন, 'ধ্যেৎ। কে বললে?'

'ভাবছেন আপনি বলেননি ব'লেই আমি আর কিছু জানিনে, না?'

'কিছু জানিস না।'

'সব জানি।'

'তা হ'লে সেই রাগেই তুই আর চিঠি লিখিসনি?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা হিংসুক তো তুই?'

'হিংসে আবার কী? রীতিমতো রাগ হয়েছিলো আমার।'

'কেন?'

'আপনার যে একটা সামান্য আত্মসম্মানজ্ঞানও নেই এটা ভাবলেই আমার—'

'আত্মসম্মান!' মালতীদি তাঁর ছোটো ভেসে-থাকা নীল চোখ তুলে আকাশে তাকালেন।

আমি উত্তেজিত হ'য়ে বললাম, 'যতো দুঃখ তো আপনার ওর জন্যই।'

মালতীদি আস্তে বললেন, 'জানি।'

'তবে?'

'সে তুই বুঝবিনে।'

'কেন বুঝবো না?'

'তুই তোর স্বামীকে ভালোবাসিস্ তো?'

'তার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই।'

'একবার ভালোবাসলে কি আর তার মুক্তি আছে রে?'

'ওর আছে আর আপনার নেই, না?'

'কী আর করা।'

'আমি হ'লে—'

'ভুল বলছিস্। যতক্ষণ ভালোবাসা আছে ততক্ষণ কিছুই করবার থাকে না।'

'ভালোবাসা না ছাই। অমন লোককে আবার কেউ ভালো-বাসতে পারে!'

মালতীদি তেমনি তাকিয়ে রইলেন আকাশে।

আমি বললুম, 'এবার আপনি বিয়ে করুন।'

'দে না একটা খুঁজে-পেতে।' আশ্বস্ত হ'য়ে হাসলেন মালতীদি।

'দেবো।' মালতীদির একটা নরম হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বললাম, 'ঠাট্টা নয়। বিয়ে না-করলে সংসারের সুখ কী তা আপনি বুঝবেন না। একজন ভদ্র, সুস্থ, সজ্জন, ভালো স্বামী যে মেয়েদের জীবনে কতখানি তা আপনি তখুনি জানবেন যখন তাকে পাবেন।'

'পাওয়া-না-পাওয়া কি আমার হাতে?'

'নিশ্চয়ই। যে যা চায় সে তাই পায়।'

'যুক্তিতে হেরে গেলি। যদি ভেসে বেড়ানো মানুষই আমি ভালোবাসি তাহ'লে তাকে তো পাওয়াই গেছে।'

'পাওয়া ? যে-মানুষ স্ত্রীকে স্ত্রীর সম্মান দেয় না, মা হবার আস্বাদ দেয় না, তার নাম মানুষ ? তাকে আবার পাওয়া ?'

মালতীদির মুখে বিকেলের ছায়া, হাসিটি করুণ দেখালো।

'বসন্ত ক্ষণিক। সেই ক্ষণিকতাটুকুই তার মাধুর্য। কেবলই কি কচি পাতার কলরোল ? ফুল চাই না ? ফল চাই না ? তেমনি প্রেমিকাও স্ত্রী হয়, স্ত্রী-ই মা হয়। রমেনের কাছে আপনার তবে কিসের প্রত্যাশা ? কী পাবেন ?'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন মালতীদি, 'আমিও মাঝে-মাঝে তাই ভাবি। কিন্তু বারে-বারে রমেন আমাকে লক্ষ্যচ্যুত করে।'

'আপনার সেটুকু মনের জোর নেই ?'

'ও ডাকলে আমি থাকতে পারি না।' মালতীদির গলা বর্ষার বাতাসের মতো ভেজা, 'আমি বড়ো দুর্বল।'

আমার কষ্ট হ'লো এরপরে তর্ক করতে, একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'উনি এখন কোথায় ?'

'সন্ন্যাসী হয়েছে।'

'সন্ন্যাসী !' চমকে উঠলাম, 'মানে ?'

'মানে, ভগবানকে পাবার চেষ্টা করছে।'

'সে কী ?'

'আমি কলকাতা আসবার পরে ছ'মাস, আট মাস বেশ ছিলো, তারপরেই আবার দেখলাম মেয়ে বন্ধু নিয়ে ঘুরে বেড়ানো শুরু হয়েছে।'

'যা-তা। আপনি কিছু বললেন না ?'

'অসহ্য হ'য়ে ঝগড়া করলুম একদিন। সেই যে ডুবলো আর পেলুম না। ও ওই রকমই।'

'ওই রকমই!' মালতীদির নিস্তেজ গলায় আমি তাজ্জব। রেগে বললুম, 'ওকে আপনার জেল দেয়া উচিত, ওর উপর প্রতিহিংসা ব্রত গ্রহণ করা উচিত।'

'না রে, ওর কোনো দোষ নেই, দোষ আমার অদৃষ্টের। শূন্য বাড়িতে সে-কথাটাই ভাবছিলাম ব'সে-ব'সে, হঠাৎ দেখি আবার একদিন হাজির হয়েছে এসে। কী? না, সে সন্ন্যাসী হচ্ছে। গুরুর সঙ্গে দেরাদুন যাচ্ছে দীক্ষা নিয়ে। ওর চোখের দৃষ্টি নিষ্পাপ, মুখের দিকে তাকালে আমি পৃথিবী ভুলে যাই, ওর দোষগুণ সব মিথ্যা হ'য়ে যায় আমার কাছে। কেঁদে ফেলে বললুম, 'রমেন, আমার কথা কি তুমি কখনো ভাবো না?' বললো, 'ভাবি।'

'তবে?'

চুপ ক'রে রইলো। আমি ওর পা ভাসিয়ে দিলুম চোখের জলে, বললুম, 'তবে আমাকেও নাও।'

পা সরিয়ে নিয়ে বললো, 'কোনো বন্ধন স্বীকার করাই আমার অভ্যাস নয় মালতী, একমাত্র তুমিই আমাকে বারে-বারে বাঁধো। আমাকে ভুলে যাও তুমি।'

'নিষ্ঠুর, এই কি তোমার কথা?'

'এই আমার একমাত্র কথা।'

'তুমি কি মানুষ?'

'কী করবো, বিধাতাই আমাকে এমন ক'রে গড়েছেন।'

'বিধাতার দোষ দিয়ো না। বিধাতা নিজেও তোমার মতো পাথর নন।'

'হয়তো তা-ই। সত্যি কথা বললে আঘাত পাবে, তবু বলি তোমাকে আমার ভালো লাগে কিন্তু ভালো আমি বাসি না।'

এ-কথা শুনে বুকটা যেন বন্ধ হ'য়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত নিশ্বাস নিতে পারলুম না। শান্ত হ'য়ে উঠে বসলাম ধীরে-ধীরে, বললাম, 'কাকে ভালোবাসো ?'

'কাউকেই না। ভালোবাসতে আমি শিখিনি।'

'তাই বুঝি এতকাল পরে ঈশ্বরকে ভালবেসে ভালোবাসা অভ্যেস করবে ?'

রমেন হাসলো, 'কে জানে, তাঁকে বাসবো ব'লেই হয়তো এতোদিন অপেক্ষা করেছিলাম! হয়তো এতোদিনের এই তোমরা পাঁচজনই আমার অভ্যেসের চর্চা, এই লক্ষ্যে পৌঁছবার উপলক্ষ্য।'

'এতো বুক মাড়িয়ে কোন্ লক্ষ্যে তুমি পৌঁছবে রমেন ?'

'বিষ্ণুবক্ষই একমাত্র বক্ষ মালতী, সেই বক্ষ থেকেই মৃণালের [illegible] আর তো সব তৃণদল।

আমি আর কথা বলতে পারলাম না, আমার বুকের ভেতরকার হাড় পাঁজরা যেন ভেঙে গেল, যেন স্নায়ুতন্ত্রী সব কে ছিঁড়ে দিল এক টানে। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম দরজা ধ'রে, সে হাসতে-হাসতে সন্ন্যাসী হ'তে চলে গেলো।'

মালতীদি চুপ করলেন।

বিকেল আঁধার হ'য়ে এলো, আকাশে তারা ফুটে উঠলো একটি দুটি ক'রে, পেছনে উষ্ণীর শীর্ণ রেখা প'ড়ে রইলো রুপোর পাত হ'য়ে, ফিরে আসতে-আসতে। অনেক পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কদ্দিন হ'লো গিয়েছেন ?'

'চার বছর।'

'চা-র বছর!'

'চার বছর।'

'এতদিন পরেও আপনি তাকে ভুলতে পারেননি?'

'না।'

'খবর টবর নেয়?'

'নিতো না, কিন্তু আবার ডাক পড়েছে তাঁর।'

'ডাক পড়েছে মানে?'

'বলছে, আমার আশ্রমে এসো, শান্তি পাবে।'

'আপনি শান্ত না অশান্ত সে-খবরটি কে জানালো তাকে?'

'জানি না।'

'আপনিই নিশ্চয় চিঠি লিখেছিলেন।'

'না।'

'সে যাবার পরে এই তার প্রথম খবর?'

'হ্যাঁ।'

'এর মধ্যে আর চিঠিপত্র লেখেননি?'

'না।'

'আপনিও না?'

'আমি লিখেছিলাম প্রথম-প্রথম কয়েকখানা, সে জবাব দেয়নি।'

'আপনিই বা লিখতে গিয়েছিলেন কেন?'

'টিঁকতে পারতুম না, পাগলের মতো ঘুরে বেড়াতাম এখানে ওখানে, শেষে চিঠি লিখলে যেন অবসান হ'তো একটা, দুঃখের এক-টানা রেলগাড়িটা একটু থামতো হাঁপ নিতে। ওষুধ খেয়ে ঘুমের মতো।'

'কী অদ্ভুত।'

'কিন্তু জবাব না দিয়ে ভালোই করেছিলো, ভুলেই গিয়েছিলুম

প্রায়। এর মধ্যে মা মারা গেলেন, ছোট বোন দুটির বিয়ে হ'য়ে গেল, আমিও যেন মাটি পেলাম পায়ের তলায়—

'তারপর ?'

'তারপর ?' ঢোক গিললেন মালতীদি, 'ছাখ তো দেখি কী কাণ্ড—' সলজ্জ ভঙ্গিতে মুখ নামালেন তিনি।

'কাণ্ড আবার কী ?' রীতিমতো রাগ হ'লো আমার, 'আপনি আবার তাই ব'লে সন্ন্যাসিনী হ'তে ছুটবেন নাকি ?'

'না, না, ছুটবো কেন ? তবে ভাবছি কী—' মালতীদি ইতস্ততঃ ক'রে বললেন, 'একবার দেখে এলে হয় ব্যাপারটা কী।'

'কক্ষনো না।'

'আমি কি ওর জন্যে যাবো ? এক ভদ্রলোক যাচ্ছেন—'

'যাক।'

'অত ভাবছিস কী বোকা ? তুই বুঝি ভাবিস ইচ্ছে হ'লেই সন্ন্যাসিনী হওয়া যায় ? নেহাত কৌতূহল একটা।'

বুঝলাম আবার আগুনে হাত দিতে সাধ হ'য়েছে মালতীদির, আবার রমেন তাঁকে দুঃখ দিতে পণ করেছে।

৮

এর কয়েকদিন পরেই আমি গিরিডি ছেড়েছিলাম। মালতীদি রইলেন ওঁর কোন এক জমিদার আত্মীয় বা বন্ধু ভদ্রলোকের বাড়ি ছিলো সেখানে। বয় বেয়ারা দারোয়ান সবই ছিলো। আমার সঙ্গে দেখা হবার আগে পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন তিনি, আমি চ'লে আসার পর আবার সেখানেই চ'লে গেলেন। আমি চিঠি লিখেছিলাম এসে, কলকাতা এলে দেখা করতে লিখেছিলাম, লিখেছিলাম কোনোরকমেই

যেন তিনি আবার রমেনের কাছে না যান, কৌতূহলবশতও না। কিন্তু তিনি আমার কথা রাখেন নি। এমন কি মাত্র একখানা পোস্টকার্ডে একবার দু'টি লাইন কুশল প্রার্থনা ছাড়া অন্য চিঠিও লেখেননি আমাকে। আমিও অভিমানবশত আর লিখলাম না। এর পরে বেশ কয়েক বছর কেটে গেলো, স্মৃতির উপর আবার পলিমাটি জমলো, নিজের সুখদুঃখ সংসার স্বামী সন্তান এ-সবের বেড়াজালে ভুলেই গিয়েছিলাম মানুষটিকে। অবিশ্যি উড়ো খবর যে দু'চারটা ছিটকে এসে না পড়তো তা নয়, কলকাতা শহরের ট্রামে বাসে, এখানে ওখানে, কত আত্মীয় কত কুটুম্ব আর কতো যে বন্ধু ছড়ানো থাকে তা কলকাতাবাসী মাত্রই জানে। কাজেই খবরাখবরের হঠাৎ ধাক্কা লেগেই আছে।

আমার স্বামী একদিন বললেন, 'তোমার মালতীদির লেটেস্ট খবরটি জানো কি ?'

আমি তাঁকে চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'তুমি জানো নাকি ?'

'শুনলাম কিছু কিছু।'

'কী শুনলে ?' মনে মনে যথেষ্ট কৌতূহল বোধ করলেও বাইরে উদাস ভাবটাই বজায় রাখলাম আমি।

চায়ে চুমুক দিয়ে উনি একটু হাসলেন।

'ভদ্র মহিলার যা-ই বলো ইয়ে নেই।'

'ভদ্রমহিলার সমালোচনা থাক।' মালতীদির বিষয়ে এতোটুকু বিরোধিতাও আমার সয় না। আমার স্বামীর কাছ থেকেও নয়। কারো কাছ থেকেই তাঁর বিষয়ে কোনো মন্তব্য শুনতে আমি রাজী নই। নিজে অবিশ্যি এ নিয়ে অনেক কিছুই বলি, অনেক রাগারাগিও

করেছি স্বামীর কাছে। বলেছি ও-রকম একটা নির্লজ্জ মানুষ আমি দেখিনি যাই বলো, তখন স্বামীই প্রতিবাদ করেছেন, 'নির্লজ্জ কী। ভালবাসতে জানেন মহিলা।'

চটে গিয়ে বলেছি, 'ভালোবাসা না হাতি। বাজে। ওঁর এখন আসলে একজন পুরুষ মানুষের সাহায্য দরকার। জীবনটাকে তো হেলাফেলায় কাটিয়ে দিলেন, উদ্যোগ ক'রে যে একটা বিয়ে করবেন, আবার কারো দিকে তাকাবেন মন দিয়ে সেটুকু সাধ্যও তো নেই, ঐ এক রমেন নিয়েই ব'সে আছেন।'

কিন্তু নিজে বলি ব'লে অন্যে বলবে কেন? তা আমি সইবো কেমন ক'রে।

আমার স্বামী আবার একটু হাসলেন, কেননা আমার দুর্বলতা তিনি জানেন, এই প্রতিবাদের ভঙ্গিও তাঁর অজানা নয়। বললেন, 'রমেনের ডাক তো ওঁর কাছে নিশির ডাক। চাকরি বাকরি ছেড়ে দিয়ে দিব্যি আশ্রমে গিয়ে বসেছেন!'

'পুরোনো খবর। নতুন কিছু থাকলে দাও।'

'ওঁর বই বেরিয়েছে একখানা। উপন্যাস।'

'তাই নাকি?' এবার উৎসাহিত হ'য়ে ফিরে তাকালাম, 'উপন্যাস লিখেছেন নাকি?'

'রিভিউ দেখলাম কাগজে, খুব প্রশংসা করেছে।'

'কোথায়? কোন্ কাগজে?' মালতীদি লেখেন তা-ই জানতাম। আগেও মাঝে-মাঝে এ-কাগজে ও-কাগজে দু' চারটা কবিতা বেরুতো তাঁর। বই বেরুনোটাও নতুন, উপন্যাসের খবরটাও নতুন।

স্বামী বললেন, 'খুব সম্ভব অমৃতবাজারে। বার লাইব্রেরিতে দেখলাম।'

'এনে দিয়ো তো।'

'কোন্‌টা ?' হাসলেন তিনি, 'বইখানা, কাগজখানা, না পুরো মানুষটাকে ?'

'অতো ঠাট্টা করছ কেন ?'

'আহা, ঠাট্টা কেন করবো। ভদ্রমহিলা শুনছি সাধনার কতো উচ্চ স্তরে বিচরণ করেছেন এখন।'

'ভালোই তো।' গম্ভীর হ'য়ে অন্য দিকে তাকালাম। যে যে-ভাবে শান্তি পায় সেটাই তাঁর সাধনা। হয়তো তিনি এ-ভাবেই রমেনকে পাচ্ছেন।'

'আমি-ই কি তা অস্বীকার করছি।' ঈষৎ হেসে আমার স্বামী তাঁর মোটা পাইপে আগুন ধরালেন। প্রসঙ্গ সেইখানেই শেষ হ'লো।

কিন্তু তা নয়। সুখ শান্তি যে-কোনো উপায়েই ধরা দেবে না তাঁর কাছে সেটুকু বোঝা গেল কয়েকদিনের মধ্যেই। হঠাৎ মালতী-দির সঙ্গে আমার ট্রামে দেখা হ'য়ে গেল। খাটো চুলে রোল ক'রে, বেঁটে ছাতা হাতে নিয়ে, মস্ত ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে তিনি জানালা ঘেঁসে ব'সে আছেন। কী ভাবছিলেন কে জানে, প্রথম কয়েক মুহূর্ত পাশের মানুষটিকে অনুভব করতে পারলেন না। আমিও খেয়াল করিনি, তারপরেই মুখ ফিরিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'মালতীদি!'

মালতীদি চকিত হ'য়ে তাকালেন, তারপর দুই চোখ ভরা উপচে-পড়া আনন্দ নিয়ে আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন, 'এই যে তুই, কেমন আছিস রে ?'

'তা দিয়ে আপনার কী দরকার ?' অভিমান করলাম। আপাদ-মস্তক লক্ষ্য ক'রে অবাক হলাম একটু। এত বছর পরে, এত বয়সেও মালতীদি কিন্তু ঠিক তেমনিই আছেন। তেমনি কাঁচা মুখ, তেমনি চুলের ডৌল, ব্যবহারের উষ্ণতা তেমনিই মনোহারী। কিন্তু

সন্ন্যাসিনীর চিহ্ন কই ? বরং গোল-গোল দু'হাতে দুটি অত্যন্ত ভারী নতুন ঝকঝকে পাথর বসানো মকরমুখ বালা। রীতিমতো দামী।

'দরকার নেই বুঝি ?' হাসলেন তিনি। 'যেন তোরই কতো দরকার ছিলো।'

'ছিলো কি ছিলো না তার অনেক প্রমাণ দিয়েছি, তর্ক করবো না।'

'রাগ করিস না। বাচ্চারা কেমন আছে বল, অসিতবাবু কেমন আছেন ?'

'আপনি কেমন আছেন ?'

'দেখছিস তো। তুই কিন্তু আগের চেয়ে অনেক সুন্দর হয়েছিস। অনেক মোটা। খবর পেলাম বাড়ি বদলেছিস।'

'খবর-টবর তা হ'লে একটু পানও ?' আমার আর অভিমান কাটে না।

'আমাকে ভাবিস কী ? কলকাতা এসে পুরোনো বন্ধু বা আত্মীয়ের মধ্যে একমাত্র যার কথা আমার সব সময় মনে পড়েছে সে তো তুই।'

'ইশ।'

'খোঁজ নিয়েই তো জনলাম সে-বাড়িতে অন্য ভাড়াটে।'

খুশি হলাম। বললাম, 'কোথায় আছেন ?'

'চল্ না, দেখে আসবি।'

'ঠিকানা দিন, ঠিক যাবো।'

'ঠিকানার দরকার নেই, আমার সঙ্গে চল।'

'এখন ?'

'ক্ষতি কী ?'

'বাড়িতে ভাববে যে।'

'কী আবার ভাববে, হারিয়ে যাবি না সেটাতো ঠিক ?'

'চাপা যে পড়বো না সেটাতো জানা নেই।'

মালতীদি পিঠে হাত রেখে হাসলেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, একটা না হয় ফোন ক'রে দেয়া যাবে ব্যারিষ্টার সাহেবকে, তবেতো হবে ?'

'সেটা অবিশ্যি হ'তে পারে। কিন্তু তার চেয়ে আপনিই চলুন না।'

'আজ তুই-ই চল, নিজের ঘরে নিজের মানুষটিকে নিয়ে এসে দেখা আর তার ঘরে গিয়ে তাকে দেখা ছ'টোতে তফাত আছে। আর আমাকে ও আমার পরিবেশে দেখবি কেমন আছি। চল।'

'কিন্তু—'

'আর কোনো কিন্তু নয়।'

আমার কোনো ওজর শুনলেন না সেদিন মালতীদি, জোরজার ক'রে ধ'রে নিয়ে এলেন তাঁর বাড়িতে। কৌতূহল বা ইচ্ছে আমারও যে ছিলো না তা নয়, একান্তে সঙ্গলোভও ছিলো বৈ কি। কাজেই হয়তো খুব জোরও করতে হ'লো না।

সেই টালিগঞ্জের শেষ প্রান্তে গঙ্গার ধারে জনমানবশূন্য নিরালা নির্জন কুটির একটি। সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছিলো, আমাকে অন্ধকারে দাঁড় করিয়ে ঘরের তালা খুলে ভেতরে গিয়ে লণ্ঠন জ্বালালেন। চার-দিকে তাকিয়ে আমার ভয় করছিলো। সেটা এখনকার টালি-গঞ্জের গঙ্গার ধার নয়, সেখানে তখন সাপ খোপ শেয়াল সরীসৃপেরই বসবাস ছিলো বেশি। চারদিকের ঝোপঝাড় জঙ্গলে তাকিয়ে মনে হ'লো কোনো ডাকাতদের গোপন আস্তানায় এসে পথ ভুল ক'রে দাঁড়িয়ে আছি।

মালতীদি বেরিয়ে এলেন, উঁচু ক'রে লণ্ঠন হাতে ঝুলিয়ে বললেন, 'আয়।'

পায়ে পায়ে ভেতরে ঢুকলাম। এলোমেলো অগোছালো ঘর,

মেঝেতে মাত্বরের উপর একরাশি বইপত্র ছড়ানো ছিটোনো, সে-সব দু'হাতে সরিয়ে মালতীদি জায়গা করলেন একটু, তারপর বললেন, 'বোস।'

একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'এখানে থাকেন ?'

হাসলেন তিনি, 'খারাপ নাকি ?'

'না, খারাপ আর কী।' আপনা থেকেই একটা মস্ত দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো, মালতীদি মুখ নিচু করলেন। তাঁর নিচু-করা মাথার সিঁথিতে লণ্ঠনের আলোর স্তিমিত রেখাটি জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো, তাজ্জব হ'য়ে দেখলাম সিঁথিটি ঠিক অল্পবয়সের মতোই ঘন চুলের চাপে সরু আর সুদূর, আর সেই সরু' আর সুদূর কুমারী সিঁথিটি সিঁদুরে রঙিন।

মুখ তুলে একটু হাসলেন, আস্তে বললেন, 'কী দেখছো ?'

'বিয়ে করেছেন ?'

'তা করেছি।'

'রমেন সেনের তা হ'লে সুমতি হ'য়েছে ?'

'না।'

'তবে ?' আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

'আমি গোপালনগরের জমিদার নরনারায়ণ চৌধুরীকে বিয়ে করেছি।'

'নরনারায়ণ চৌধুরীকে ?'

'হ্যাঁ।'

কয়েক মুহূর্ত দু'জনেই চুপ।

বাইরে একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক উঠেছে, হাওয়ার শব্দ শাঁ-শাঁ করছে বড়ো-বড়ো গাছের মাথায়, শেয়াল হেঁকে উঠলো দুবার। মালতীদি বললেন, 'খুব অবাক হচ্ছো ?'

'তিনিও এখানেই থাকেন ?'

'না।'

'কোথায় থাকেন ?'

'তিনি তাঁর পূর্ব বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর নিজের বাড়িতে থাকেন।'

'স্ত্রীর সঙ্গে।'

'হ্যাঁ।'

আমি আবার চুপ।

অনেক পরে বললাম, 'আর আপনি এই ?'

'আমি এই ?'

'স্ত্রী আছে, তবুও আপনাকে বিয়ে করেছেন ?'

'একটু ভুল হয়েছিলো,' মুখখানা করুণ হ'য়ে উঠলো মালতীদির, চোখ নামিয়ে নিয়ে বললেন, 'রমেন বলেছিলো—'

'এখানেও রমেন ?'

'এখানেও রমেন।' হাসলেন মালতীদি, 'আমার স্বামী রমেনেরই বন্ধু। রমেনের সূত্রেই এঁর সঙ্গে আমার আলাপ।'

'ও, বিয়েও তাহ'লে রমেনই দিলো ?'

'না, তা নয় ঠিক। আমরাই করলাম।'

গোপালনগরের এই জমিদারনন্দনটির অনেক খ্যাতিই শুনেছি, কিন্তু চরিত্রবান ব'লে কখনো শুনিনি। বললাম সে-কথা। আমার বলার সুরে হয়তো ঈষৎ ঝাঁঝ ছিলো। মালতীদি অস্থির হ'য়ে বললেন, 'না, না, মানুষ তো খারাপ নয়, খুব ভালো।'

না-ব'লে পারলুম না, 'তাই কি এক স্ত্রী থাকতে আরেকজনকে বিয়ে করেছেন ? আর বিয়ে ক'রে আপনাকে এই ভাবে রেখেছেন ?'

মালতীদি আকাশ পেলেন না, নীলচোখ ঘরের সিলিঙেই ভাসিয়ে দিলেন।

অনেক পরে ধীরে-ধীরে, ভাঁজে ভাঁজে দ্রৌপদীর শাড়ির মতো উন্মোচিত করলেন তাঁর সব কথা।

বললেন, 'গিরিডিতে আমি যে-বাড়িতে ছিলুম, মনে আছে তোর?'

'আছে।'

'আমার স্বামীরই বাড়ি সেটা।'

'আপনার স্বামীর?'

হাসলেন তিনি। 'তখন অবিশ্যি স্বামী ছিলেন না, কখনো হ'তে পারেন এমন কল্পনাও ছিলো না। রমেন—'

'রমেনই সেই কল্পনার ক্ষেত্রটিকে উর্বর করলো বুঝি?' আমি অধৈর্য হলাম।

মালতীদি শান্ত গলায় বললেন, 'রাগ করিস না, রমেনের দোষ নেই, রমেন কিছুই করেনি। কলকাতায় থাকতে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো। সেই থেকে ভদ্রলোক প্রায়ই আসতেন, নানা ভাবে আমাকে খুশি করার চেষ্টা করতেন, কাজে লাগবার চেষ্টা করতেন। বড়ো ঘরের ছেলে, আদবে কায়দায়, বিনয়ে, ভদ্রতায় দুরস্ত ছিলেন খুব। আমার ভালোই লাগতো।'

'ওর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়নি?'

মালতীদি এই প্রশ্নের জবাবে উঠে গিয়ে কোণের কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেলেন, খানিক জল হাতে মুখে মাথায় বুলিয়ে নিয়ে ফিরে এসে মাদুরে বসতে বসতে বললেন, 'ভদ্রলোক বিবাহিত কি অবিবাহিত তখনো জানতুম না, আর তুই তো জানিস আমার খেয়াল কম, কৌতূহল কম, সে-বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসাও আমার মনে

আসেনি। শুনেছিলাম ধনী ব্যক্তি, সাজে পোশাকে, গাড়িতে জুতোতে তার প্রমাণও যথেষ্ট ছিলো। তোকে বলেছিলাম, এক ভদ্রলোক দেরাদুন যাচ্ছেন, তার সঙ্গে যাবো, মনে আছে?'

'সেই ভদ্রলোক?'

'তিনিই।' মালতীদি লণ্ঠনের আলোটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে একটা লম্বা নিশ্বাস নিলেন।

ঘরে, মেঝেতে পাতা ঐ একমাত্র মাদুরটি ছাড়া অন্য কোনো আসবাব ছিলো না। খাড়া হ'য়ে ব'সে থেকে আমি আড়মোড়া ভাঙলাম, এককাপ চায়ের তৃষ্ণা বোধ করলাম। আর তখনি আমার মনে হ'লো মালতীদি ফিরে এসে কিছু খেলেন না কেন? বললাম, 'আপনার রান্না করে কে?'

'কে আবার, যখন পারি নিজেই করি, নয়তো বাইরে-টাইরে কোথাও খেয়ে আসি।'

'কাজের লোক নেই?'

'না। এতো দূরে এখানে কেউ আসতে চায় না।'

'হাট-বাজারও তো বোধহয়—'

'অনেক দূরে। বিস্কুট খাবি? বিস্কুট আছে। চা যে দেবো তার উপায় নেই। স্টোভটা খারাপ হ'য়ে প'ড়ে আছে, তার উপরে কেরোসিন আনতে ভুলে গেছি। দেখছিস না, তেলের অভাবে লণ্ঠনটা কেমন নিভে-নিভে আসছে।'

আমার ভয় করলো। এমন একটা জনশূন্য জঙ্গলে আলো নিভে গেলে উপায় হবে কী? এখানে সাপ শেয়াল তো দূরের কথা, বাঘ থাকতেই বা বাধা কী। ব্যস্ত হ'য়ে বললাম, 'ক-টা বাজলো?'

'সাতটা হবে,' হাতের ঘড়ির দিকে তাকালেন তিনি, 'এটা এতো

ছোটো আর চল্লিশের চোখ এতো খারাপ যে এ-ঘড়িটা আমার পক্ষে প্রায় আজকাল অব্যবহার্য হ'য়ে উঠেছে।'

মনে পড়লো ঘড়িটা মালতীদিকে ঢাকা থাকতেও পরতে দেখেছি, সেই শাঁখার মতোই লেগে থেকেছে হাতে। রমেনের উপহার। দামি জিনিস। এখনো তা হ'লে সবটুকু মুছে ফেলতে পারেন নি? একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'দেরাদুনে গিয়েছিলেন, সে খবর আমি জানতাম। রমেন কী বললো?'

'ও যে কী ইরেস্‌পন্‌সেবল বলা যায় না।' মালতীদি ঢোঁক গিললেন, 'ওর চিঠি না পেলে কি আমি যেতাম সেখানে? তুই বল? অথচ যখন গেলাম যেন আকাশ থেকে পড়লো।'

মালতীদির মুখের দিকে তাকিয়ে আমি একটা যন্ত্রণা দেখতে পেলাম। আগের মালতীদিকে মনে প'ড়ে আমারও যন্ত্রণা হ'লো। সামনে প'ড়ে-থাকা, আধভাঙা হাত-পাখাটা তুলে হাওয়া খেতে-খেতে বললাম, 'কী বললো?'

'কী আবার বলবে। আশ্রমে জায়গা দিতে পারলো না। গেরুয়া প'রে, সঙ্গে সুন্দরী শিষ্যা নিয়ে, খবর পেয়ে বাইরে এসে নির্বিকার মুখে বললো, "তুমি। কী আশ্চর্য, তুমি এলে কবে?"

যেন আমি বেড়াতে এসেছি। আর বেড়াতে-বেড়াতে হঠাৎ দেখা করছি ওর সঙ্গে। রাগ ক'রে বললাম, "কবে আবার, এইমাত্র।" একগাল হেসে বললো, "হঠাৎ?"

"হঠাৎ! হঠাৎ কেন?" গলার স্বর হয়তো চ'ড়ে থাকবে আমার, বললাম, "তুমিই তো আসতে লিখেছ।"

"কী পাগল।" দয়ার অবতারের মতো বিগলিত মুখভঙ্গি ক'রে বললো, "তাই ব'লে এমন বিনা নোটিসে কেউ আসে?"

"তোমার কাছে আসতে হ'লে যে আজকাল নোটিস দিতে হয় সেটা আমার জানা ছিলো না।"

"আহা, তা কেন? এখানে আসা কি আর আমার কাছে আসা? আমি কে? এই আশ্রমের নিয়মকানুনের কথা বলছিলাম আমি। এখানে আসতে হ'লে একমাস আগে থেকেই জায়গা নেবার ব্যবস্থা করতে হয়, তারপর দীক্ষা নিয়ে ঢুকতে হয়।"

আমার চোখে জল এসে গেলো, বুকের মধ্যে যে কেমন করলো জানি না। রমেনের মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম আমি, ও চোখ নামিয়ে নরম গলায় বললো, "অবশ্যি নরনারায়ণ যখন সঙ্গে আছে এতো ভাবনার কিছু নেই। বরং এসেছো, ভালোই হ'লো, দেখা হ'লো।"

আমি চুপ।

নরনারায়ণ আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো, "কী হ'লো? আমাকে কি যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য মনে হচ্ছে না নাকি?"

রমেনও হাসলো, "ও ঐরকমই। এতো নার্ভাস।"

এর উত্তরে কিছু বলতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু গলা বুজে এলো আমার।

বলাই বাহুল্য, শেষ পর্যন্ত একটা হোটেলেই উঠতে হ'লো আমাকে। নরনারায়ণই নিয়ে এলো। অত্যন্ত উঁচুদরের হোটেল, চার্জ হৃদয়বিদারক। আরামের উপকরণও অবিশ্যি তার তুলনায় যথেষ্ট বৈ এক ফোঁটা কম নয়। মস্ত ঘরে মস্ত-মস্ত জানালা যেন সারা আকাশটাকে মুঠোয় ক'রে ভেতরে নিয়ে এসেছে। তাকালে ধূ ধূ পাহাড়ের সারি, ঘন সবুজ মখমলে মোড়া। জানলা ঘেঁষে নরম কৌচ, মেঝে জুড়ে নরম কার্পেট, খাট জুড়ে ডবল স্প্রিঙের উপর

গদি। বেল বাজালেই পরিচারক এসে হাজির, চাইলেই চা; ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ আর ডিনারে খাবারের স্বাদুতা আর প্রাচুর্য একটা মনে রাখার মতো ব্যাপার।

নারায়ণ বললো, "পছন্দ হয়েছে? বেশ কম্ফর্টেবল বোধ করছেন তো?" আমি আর কী বলবো, আমার রীতিমতো কান্না পাচ্ছিলো। দেরাদুনে আসবার টিকিট কাটতেই আমার দম ফুরিয়ে গেছে। সামান্য চাকরি করতাম, ছেড়ে ছুড়ে চ'লে গিয়েছিলাম। ধারণা ছিলো, বাকি জীবনটা বুঝি ওখানেই নিরুপদ্রবে কেটে যাবে। রমেন আমাকে আশ্রম সম্বন্ধে সেই রকমই একটা অস্পষ্ট ছবি দিয়েছিলো। সামান্য যা পুঁজিপাটা সব খুইয়েই আমি রওনা হয়েছিলাম, এমন কি ফ্ল্যাটটা পর্যন্ত ছেড়ে গিয়েছিলাম।

আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে নরনারায়ণ আবার বললো, "যদি বলেন তবে অবিশ্যি 'রেইনবো'-তেও যাওয়া যায়। সে হোটেলটা এর চেয়েও ভালো, আর বাড়িটা একেবারে একটা টিলার উপরে, শহর থেকে দূরে।" আমি বললাম, "দেখুন, আমার সাধ্য খুব কম। তাই ভাবছিলাম এর চেয়ে কম দামি কোনো থাকবার ব্যবস্থা নেই এখানে?"

নরনারায়ণ জোরে হেসে উঠলো, "ও, এখন তা হ'লে এটাই আপনার সবচেয়ে বড়ো চিন্তা?"

হাসি দেখে কী জানি কেন আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে এলো। নরনারায়ণ হাসতে-হাসতেই বললো, "তা থাকবে না কেন? শুধু হোটেল নয়, ইচ্ছে করলে আপনি ধরমশালাতেই বা থাকতে পারবেন না কেন? সে তো বলতে গেলে ফ্রী।"

"তবে আমাকে তাই নিয়ে চলুন।"

আমার ব্যগ্র কণ্ঠস্বরে একটু চকিত হ'লো বোধ হয়। ঝকঝকে

পালিশ গালে চুলে নখে জুতোয় একাকার মানুষটি এবার বৈষ্ণব ভঙ্গিতে নম্র হ'য়ে বললো, "আপাতত আপনি আমার অতিথি। যথাযোগ্য ব্যবস্থা আমি নিশ্চয়ই করতে পারিনি, আমি জানি আমার অযোগ্যতার কোনো তুলনা হয় না, আপনার মতো মানুষকে আমার মতো মানুষের আতিথ্য গ্রহণ করানোই প্রায় বাতুলতা, তবু বলি দয়া ক'রে সেই সম্মানটুকু অন্তত কয়েকদিনের জন্য দিন আমাকে।"

আমি তাঁর ভদ্রতায় মুগ্ধ হলাম, কিন্তু ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, "তা কখনো হয় ?"

"কেন হয় না ?"

কেন হয় না সে-কথা বোঝাই কেমন ক'রে যদি না সে নিজে বোঝে। সেদিন অনেকটা সময় আমার ঘরে রইলো সে, বাক-বিতণ্ডা হ'লো খানিকক্ষণ, তারপর আমাকে শহর দেখাতে নিয়ে গেল। আমি পরের দিনই রমেনকে জানালাম সে-কথা। লিখলাম, "কী করি বলো তো ? আমার হাত শূন্য। কর্তব্যবোধ থেকে না দাও ধার হিসেবেই না-হয় খরচটা চালিয়ে দাও কদিন। তুমি তো মানুষ, একটা অতীত তো আছে ?" সে জবাব দিল, "অনেক তো বয়েস হলো, আর কতো কাল এমন ছেলেমানুষ থাকবে ? নরনারায়ণ আমার মোটেই পর নয়, অতিশয় অন্তরঙ্গ বন্ধু ; তার কাছে এত বেশি লজ্জা না-করলেই সুখী হবো।"

আমি আবার লিখলাম, "তোমার বন্ধু তো আমার কী ? আমি কেন হাত পেতে নেবো তাঁর কাছ থেকে ? আর কিছু না পারো দয়া ক'রে ফেরবার টিকিটটা কেটে দাও, চ'লে যাই।"

চিঠি লেখালেখি যখন, তখন বুঝতেই পারছো আমাদের দেখাশোনা হচ্ছিলো না। রমেন ইচ্ছে করলেই সব সময় সকল

মানুষের সঙ্গে দেখা করতে পারতো না, সেটা নিয়ম ছিলো না তাদের আশ্রমের। এই চিঠি পেয়ে একদিন সে এসে হাজির। যেমন সকলের সঙ্গে দেখা করার নিয়ম ছিলো না, তেমনি আশ্রম থেকে স্বাধীনভাবে সব দিন গণ্ডির বাইরেও ওদের পা দেবার আইন ছিলো না। সপ্তাহে একদিন নির্দিষ্ট ছিলো। সেদিন ছিলো সেই নির্দিষ্ট তারিখ। এসেই আমার পাশে ব'সে পিঠে হাত রাখলো, "বাঃ, চমৎকার আছো তো। সুন্দর তো ঘরটি, নরনারায়ণের যত্নে তাহ'লে মন্দ নেই।"

রাগ ক'রে হাত সরিয়ে দিয়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, "এ-ভাবে কেন তুমি আমাকে অপদস্থ করলে? আমি তোমার কী করেছি? কেন তুমি আমার সঙ্গে বারে-বারে এই শত্রুতা করো?"

রমেন আমার অভিমান দেখে তার ধনুক-বাঁকা আশ্চর্য ঠোঁটে দারুণ হাসলো, চিরপরিচিত ভঙ্গিতে বেড-কভারের তলা থেকে বালিশ দুটো বার ক'রে নিয়ে বুকের মধ্যে দুমড়োতে-দুমড়োতে বললো, "লক্ষ্মীটি, রাগ কোরো না, এক কাপ চা খাওয়াও তোমার বেয়ারাকে ব'লে। আরো যদি কিছু খাওয়াতে পারো তাও দিয়ো।"

আমি বললাম, "এখানে আমিই খাই অন্যের পয়সায়। তোমাকে খাওয়াবো সে-শক্তি যদি থাকতো তা হ'লে সেটা নিজের জন্যেই খরচ করতুম।"

বললুম বটে, কিন্তু মন আমার নরম হ'য়ে এসেছে। দরজা-বন্ধ ঘরখানাতে একা তার অস্তিত্ব অনুভব করতে-করতে আমি কোথায় কতদূর চ'লে গিয়েছি। আমার সামনে কিছু নেই, সব পেছনে। সেই পেছনে ফেলে-আসা দিনগুলো যেন মাখামাখি হ'য়ে উঠে

এসেছে এই ঘরখানার মধ্যে। হাতের ঘড়ি দেখলো রমেন, অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, "সময়ের মেয়াদ আমার ভারি কম, রাগ ক'রে আর কী করবে। আমি যে নিতান্ত হৃদয়হীন তার পরিচয় তো তোমার অজানা নয়। আর কেন আমি এ-রকম, কেন কোনো বন্ধনই আমাকে বাঁধতে পারে না তাও আমি জানি না। সে জন্যেই সব ছেড়ে ছুঁড়ে চ'লে এসেছি এখানে। তোমাকে তো বলেছি মালতী, আমাকে তুমি ভুলে যাও।"

মুখ ফিরিয়ে কেঁদে ফেললাম, "নিষ্ঠুর, ভুলতেই কি তুমি দাও আমাকে?"

রমেন চুপ ক'রে রইলো। অনেক পরে বললো, "দেবো।" হোটেলের অন্য স্যুইট থেকে ডেকে নিয়ে এলো নরনারায়ণকে, হাসিতে খুশিতে চঞ্চলতায় যেন বড়ো বেশি ছটফট করতে লাগলো, তারপর যে-কদিন আছি সে-কদিন শহর বেড়ানো থেকে আরম্ভ ক'রে রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত ভার নরনারায়ণের উপর চাপিয়ে চ'লে গেল একটু পরে।

আর আমি তাকে দেখিনি। চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হয়েছি, চিঠি লিখে জবাব না-পেয়ে অস্থির হয়েছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেছি আশ্রমের দরজায়, কোনো ফল হয়নি।

ছ' মাস ছিলাম। ভদ্রলোকের আদরে যত্নে মুগ্ধ না-হ'য়ে পারি নি। আস্তে-আস্তে রমেনের কথা চিন্তা করা ছাড়াও অন্য চিন্তা দেখা দিয়েছিলো মনে, রমেনকে ছাড়াও শেষের কয়েকটা দিন দেরাদুনে আনন্দেই কেটেছিলো। এই হ'লো সূত্রপাত। না, সূত্রপাত নয়, সূত্রবন্ধন।

মালতীদি চুপ করলেন।

৯

একটা নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ ভেসে এলো ঘরের মধ্যে, জানলা দিয়ে ঝুপ ক'রে একটা বেড়াল লাফিয়ে পড়লো। আমি চমকে উঠেছিলাম, মালতীদি তাকে হাত বাড়িয়ে কোলে নিয়ে আদর করতে-করতে বললেন, 'সব ডিটেলস্ শুনে আর কী করবি। ফিরে এলাম একসঙ্গেই, এসেই প্রথমে হাতের মকর-মুখ মোটা বালাদুটো আর গলার পাটিহারটা বিক্রি করলাম। হারটা অবিশ্যি আমার মার ছিলো, আর সোনাও ছিলো অনেক। যা টাকা পেলাম সবটাই দিয়ে দিলাম তাঁর হাতে। বললাম, 'আপনার ঋণ শোধ করা আমার সাধ্য নয়, তবু—'

ভদ্রলোকের ফরসা রংয়ে দুধের মধ্যে একফোঁটা আলতা গোলা হ'লো। ভারি গলায় বললেন, 'এভাবেই শেষে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে দিলেন?'

ছি-ছি ক'রে উঠলাম, 'এ-সব কী বলছেন আপনি! ওখানে কি সোজা খরচ হয়েছে? এতে তো তার অর্ধেকও হ'লো না।'

ভদ্রলোক একটি কথা বললেন না, একটিবার তাকালেন না, নোটগুলো টেবিলের উপর উড়তে লাগলো ফড়ফড় ক'রে, তিনি সোজা বেরিয়ে গেলেন দরজা দিয়ে! আমি একেবারে হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমি যে-বাড়িতে এসে উঠেছিলাম, সেটা আমার পিসতুতো বড়দাদা ডক্টর চিদানন্দ দত্তের বাড়ি। বড়দা তখন লণ্ডনে বক্তৃতা দিতে গেছেন, তিনি বিপত্নীক, দুই ছেলে শিলং পাবলিক স্কুলে পড়াশুনো করে, বলতে গেলে তাঁর কলকাতার বাড়িটি বারো মাসই চাকর-বাকর নিয়ে খালি প'ড়ে থাকে। মাঝে-মাঝে আত্মীয়

পরিজনরা এসে থেকে যায় ছ'চার মাস। দেরাছন থেকে ফিরে এসে আমারও ঐ বাড়ি ছাড়া ওঠবার অন্য জায়গা ছিলো না। ফ্ল্যাট খুঁজছিলুম। খুঁজছিলুম মানে ঐ ভদ্রলোকই খুঁজে দিচ্ছিলেন। বই পড়তে পারা ছাড়া অন্য কোনো কাজই আমি বড়ো একটা গুছিয়ে করতে পারতুম না সে তো তুই জানিস। ঘুরে-ঘুরে বাড়ি দেখে ঠিকানা খুঁজে আবার বাড়িওলার সঙ্গে দেখা করা, দেখা ক'রে আবার পাঁচ টাকা ভাড়া কমানো, এ-সবের কথা ভাবলে আমার গায়ে জ্বর আসতো। আসল কথা কী জানিস, আমি মানুষটা ভারি অযোগ্য, ভারি অপটু।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মালতীদি একটু চুপ করলেন, সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের ভেতরটাতে যেন ঝিম ধরলো। সামনের মস্ত বট অশ্বত্থের ঘন ডালের বাতাসে শকুনবাচ্চা কেঁদে উঠলো একটা, জানলা কাঁপিয়ে শনশন বাতাস ব'য়ে গেল, মালতীদির চোখের পাতা কাঁপলো, হাতের আঙুল কাঁপলো, এমন কি কথা বলতে গিয়ে লালচে রংয়ের ঈষৎ ভারি, ছোটো, গোল, বাঁকা ঠোঁট ছুটিও থরথর করলো ছবার। আমার মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আস্তে বললেন, 'এর তিন মাস পরে আমার মনে হয়েছিলো এই বুঝি আমার সংসারধর্ম পালন করবার যোগ্য লোক এতদিনে জুটেছে জীবনে।'

'রমেনকে ভুলে গেলেন?' বলে উঠলাম আমি। মালতীদি তাঁর সজল চোখ আমার চোখে মিলিয়ে বললেন, 'ভুলবো কেন? ভোলা কি যায়? সে চাপা পড়লো। আর তা ছাড়া তুই-ই বল, একটা সাধ কি হয় না? ইচ্ছে কি হয় না? আমি কি স্ত্রী হবার পক্ষে, মা হবার পক্ষে খুব অযোগ্য?'

মুহূর্তের বিরতি। শুধু কয়েক ফোঁটা চোখের জল নিঃশব্দে

মালতীদির বুকের কাপড়ে চুপসে গেলো। এর পরে আমার দিকে আবার তাকালেন তিনি—'আবার আমার ভুল হ'লো, মণি। ইনি আমাকে বুঝিয়েছিলেন স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কোনো সম্বন্ধ নেই। ছেলেবেলায় বাপ-মায়েরা ধ'রে বিয়ে দিয়েছিলেন শখ ক'রে, প্রায় অবোধ বয়সে, আবার বাপ-মায়েরা মিলেই ঝগড়া-বিবাদ ক'রে তার উচ্ছেদ ক'রে দেন।'

আমি ব্যথিত হ'য়ে বলেছিলাম, 'আহা, তা হ'লে সেই মেয়েটির কী দশা হ'লো ?'

'তাঁর দশার কথা ভেবে তোমাকে দুঃখ পেতে হবে না।' হাসলেন তিনি, 'তিনি বেশ সুখেই আছেন। আমি একটা দুর্বৃত্ত নই, বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে যে-মুহূর্তে বুঝেছিলাম পিতামাতার পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদের জন্য একটি অপাপবিদ্ধা বালিকার সাফার করবার কোন প্রশ্নই ওঠে না, সেই মুহূর্তেই দেখা করেছিলাম তার সঙ্গে। ষোলো-সতেরো বছরের অপূর্ব সুন্দরী, নামত আমার স্ত্রী মহিলাটি তখন অন্য কোনো যুবকের সঙ্গে প্রেম করতে ব্যস্ত ছিলেন। আমাকে দেখেই ঠোঁট বাঁকিয়ে দরোয়ান ডেকেছিলেন। তারপরে সমস্ত স্ত্রী জাতটার উপরই আমার ঘেন্না ধ'রে যায়। কোনোদিন কোনো মেয়েকে ভালোবাসার কথা ভাবতেও আমার রাগে মাথা জ্বলে যেতো। আর সত্যি বলতে কী, দেখেছি তো অনেক, অনেক সুযোগও পেয়েছি, অনেকে কাছে এসেছে, এমন কি তুমি যতই পাষণ্ড ভাবো না কেন, এই পাষণ্ডের জন্য দু' একজন মানুষ যে একেবারে অধীর না ছিলো তাও নয়। কিন্তু—'

'কিন্তু কী ?' আমি আগ্রহ-ভরে তাকিয়েছিলাম তাঁর মুখের দিকে। তিনি নিবিড় হ'য়ে কাছে এসে মখমলের মতো নরম আর ভারি গলায় বললেন, 'কিন্তু তুমি ছাড়া আর কে আমাকে পাগল

করবে জীবনে, এতো শক্তি আর কার আছে বলো?' আবার চুপ করলেন মালতীদি।

আমি বললাম, 'তারপর?'

'তারপর আর কী। দেখতেই তো পাচ্ছিস। আমি বলেছিলাম একদিন চলো, তোমার বাড়ি-ঘর দেখে আসি।'

'বাড়িঘর যাচাই করে স্বামী পছন্দ করবে?' বিদ্রূপ করলেন তিনি।

আমি বললুম, 'তা কেন, তোমার বাসস্থান, সে তো আমারও। আর দু'দিন বাদে সেখানে গিয়ে উঠবো, তার সঙ্গে একটা চাক্ষুষ পরিচয় হ'য়ে যাক না।'

কেমন একটু ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে বললেন, 'সে বাড়িতে আমি নিয়ে যাবো না তোমাকে।'

দ'মে গিয়ে বললাম, 'কেন?'

'যতো সব বাজে আর অশিক্ষিত লোকের ভিড় সেখানে। ওখানে গেলে তো তুমি দম আটকে ম'রে যাবে।'

'আহা, আমিই যেন একটা অদ্ভুত কিছু। আমাকে ভাবো কী তুমি? দেখে নিয়ো তাদের সঙ্গেই আমার ব'নে যায় কিনা।'

'না, না, ওদের সঙ্গে আলাদা থাকবো।'

'তাতে বাড়িটা একদিন দেখে আসতে দোষ কী? পুরোনো বালিগঞ্জের লম্বা রাস্তা আলো-করা বাড়ি তোমাদের, আমার কতো দিন ওর কম্পাউণ্ডে ঢুকতে লোভ হ'য়েছে। কী গোলাপ ফোটে, বাইরে থেকে দেখা যায়।'

'শোনো মালতী,' গম্ভীর হলেন তিনি, 'আসলে আমাদের যে বিয়ে হচ্ছে, এটা আমি পাঁচকান জানাজানি করতে চাইনে।'

'কেন?' আমি অবাক হ'য়ে বললাম।

'সবই জানবে আস্তে আস্তে। এখন ও-সব থাক।'

'এখুনি বলো।'

'তুমি জেনে রাখো ও-বাড়ির সঙ্গে আমার কোনই যোগ নেই। একা আছি তাই আছি। তোমাকে নিয়ে সেখানে আমি কোনো-রকমেই বাস করতে পারবো না।'

'তোমার বাবা তো বেঁচে আছেন।'

'বাবার জন্যেই তো আরো অশান্তি। তাঁর জন্যেই আমি তোমাকে ও-বাড়িতে নিয়ে যাবো না।'

'কেন ?'

'শুনলে তুমি খুশি হবে না।'

'তবু শুনি।' আমি জেদ করলাম।

একটু চুপ ক'রে থেকে কী ভাবলেন, তারপর বললেন, 'বাবা নিজে আমার বিয়ে ঠিক করেছেন। অনেক দিন থেকেই তা-ই নিয়ে আমাদের মন-কষাকষি চলেছে। আমার মত না-নিয়ে কিছু করতেও পারছেন না, আবার ওদিকে নিজের জেদও ছাড়তে পারছেন না। বলবো কী, বাড়ির আবহাওয়াটা এখন আমার পক্ষে বিষতুল্য।'

এর পরে আমি আর বেশি কিছু বলতে পারি নি। চুপ ক'রেই ছিলাম। উনি হেসে বললেন, 'কী, মন-খারাপ হ'লো নাকি ?'

'না, মন-খারাপ কেন ?'

কাছে এসে পিঠে হাত রাখলেন, 'তোমারই বাড়ি তোমারই ঘর, তোমারই সব, কেবল কয়েকদিন একটু চুপচাপ থাকা। বিয়েটা হ'য়ে গেলে তো আর উনি ফেলতে পারবেন না, কিন্তু বিয়ের আগে জানাজানি হ'লে মিছিমিছি হুলুস্থূল হবে একটা।'

আমি বললাম, 'তাই তো।'

উনি বললেন, 'তবে মুখ ভারি ক'রে আছো কেন ?'

'কই, না তো।' বললাম বটে, কিন্তু মুখ ভারি হয়েছিলো কিনা জানি না, মনটা কেমন ভার হয়ে গেলো।

১০

'এর পরে একদিন খুব গোপনে, খুব নিঃশব্দে বিয়ে হ'য়ে গেল আমাদের। হিন্দুমতে হ'লো না ; কেননা উনি ব্রাহ্মণ, আমি কায়স্থ। রেজিষ্ট্রি ক'রে হ'লো না, উনি বিবাহিত। নবদ্বীপে গিয়ে কণ্ঠিবদল হ'লো।'

'তারপর ?' রুদ্ধশ্বাসে শুনতে শুনতে এতোক্ষণে একটা প্রশ্ন করলাম আমি। তার মালতীদি সঙ্গে-সঙ্গে শক্ত ক'রে আমার হাত চেপে ধরলেন, 'তারপর ? তারপর তুই আমার একটা উপকার করতে পারবি, মালা ?'

চমকে উঠে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, 'কী ?'

'তোর স্বামী তো একজন দিগ্বিজয়ী ব্যারিস্টার, একটা মামলা ক'রে দিবি ?'

'কিসের মামলা ?'

'চিটিংয়ের।'

'চিটিং !' আমি হতবাক্।

দ্রুতগলায় মালতীদি ফিসফিস করলেন—'এখন বলে কী জানিস্ ? আমাকে নাকি লোকটা কোনোদিন বিয়ে করেননি।'

'সে কী !'

'বলে আমিই নাকি চড়াও হ'য়ে কিছু টাকা খসাবার মতলবে এ-সব ব'লে বেড়াচ্ছি।'

আমি স্তম্ভিত হ'লাম।

'তুই-ই বল, এ লজ্জা আমি রাখি কোথায়? এ-বেদনা আমি কেমন ক'রে সহ্য করি?'

আমি উত্তেজিত হ'য়ে উঠলাম, 'এ-সব বলছে এখন?'

'যেমন আমার ভাগ্য।' মালতীদির চোখ জানালার ধূ ধূ অন্ধকারে কোথায় ভেসে গেল। 'বল তো, কী পাপ আমি করেছি যার জন্য সারাটা জীবন ধ'রেই আমার এই শাস্তির পালা চলেছে, এই অপমান ভোগ করতে হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'কী আশ্চর্য! বিয়ে তো ভদ্রলোক নিজের গরজেই করলেন।'

'তা তো করলেনই।'

'তবে আবার কী হ'লো?'

'কী আবার।' অদ্ভুত ক'রে একটু হাসলেন মালতীদি, 'স্ত্রীলোক তো ওর কাছে মাছির মতো।'

'ছি ছি!'

'টাকার বিনিময়ে বহু স্ত্রীলোকই ভোগ করেছে লোকটা, কেবল আমার উপর লোভ চরিতার্থ করবার জন্যেই ওর কণ্ঠিবদলের বিড়ম্বনা।'

'আর আপনি বিয়ে না-করা পর্যন্ত কিছুই বুঝলেন না?'

মালতীদি সজল চোখে হাসলেন, 'শুধু কি সেটুকুই বুঝিনি, আরো অনেক কিছুই তো বুঝিনি!'

'আর সব কী?'

'ওর স্ত্রী, ওর ছেলেমেয়ে, পরিবার, পরিজন—'

আমি দুই চোখে বিস্মিত বেদনা নিয়ে তাকিয়ে রইলাম মালতীদির দিকে। মালতীদি বললেন, 'আসলে ওদের পুরোনো

বালিগঞ্জের মস্ত বাড়িতে মস্ত পরিবার নিয়ে ও বাস করতো। সবই আমাকে মিথ্যে ক'রে বুঝিয়েছিলো। স্ত্রীর সঙ্গে জীবনেও ওর ছাড়াছাড়ি হয়নি। অপূর্ব সুন্দরী মহিলা, চার-চারটি ছেলেমেয়ে—'

'কী সাংঘাতিক!'

'স্ত্রী-ই সংসারের কর্ণধার। নরনারায়ণ রীতিমতো ভয় পায় স্ত্রীকে।'

'এতো সব আপনি আগে জানতে পারলেন না?' আমি যেন ধিক্কার দিলাম মালতীদিকে। মালতীদি নিশ্বাস চেপে বললেন, 'পরেও হয়তো অজানাই থাকতো, মানুষ যে এতো মিথ্যে কথা বলতে পারে এটাই আমি জানতাম না। সকলকে বিশ্বাস করাই আমার স্বভাব। আর তার মধ্যে নরনারায়ণের মিথ্যে। আমার সাধ্য কি তাকে বুঝতে পারি। লোকটা একটা পাপের কুণ্ড। এই ছাখ, জীবনী লিখছি একটা—' দেয়ালে ঠেলে-রাখা ছোটো খোলা ট্রাঙ্কের ভাঙা ডালাটি উঁচু ক'রে রাশীকৃত কাগজ বার করলেন মাতলীদি, 'এটা আমি শ্রীল শ্রীযুক্ত নরনারায়ণ চৌধুরীকেই উৎসর্গ করবো। উৎসর্গ করবো আমার স্বামী ব'লে।'

স্বামী! ও লোকটাকে স্বামী বলতে আপনার ঘেন্না হবে না?'

'আর ঘেন্না! ঘেন্না তো স্বামী না হ'লেই। আমি তার সঙ্গে বাস করেছি না? স্বামী ব'লেই যে বাস করেছি সেটা তো জানবে লোকে?'

বাইরে এক ঝাঁক পাখি উড়ে স্থির হ'লো, আর এক প্রস্থ শেয়াল ডেকে উঠলো, আমি জানালায় তাকিয়ে বুঝলাম রাত বেড়েছে, একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'মালতীদি আমি এবার যাই।'

মালতীদি আস্তে আমার হাতের উপর হাত রেখে বললেন, 'ভয় পেয়েছিস?'

ভারি গলায় বললাম, 'না পাবার কী। কী ক'রে আপনি এখানে থাকেন ?'

মালতীদির চোখ হাসিতে টলটল করলো, 'বোকা। তার চেয়ে তোর জিজ্ঞেস করা উচিত ছিলো, "কী ক'রে আপনি এই বনবাসে এলেন।" মালতীদির হাসি দেখে আমার কান্না পেলো, বললাম, 'এসেছেন যে তা তো দেখতেই পাচ্ছি, তার জন্য কতটা পথ হেঁটেছেন, কত পাহাড় ডিঙিয়েছেন, কত আগুন মাড়িয়েছেন, সাগর সাঁতরেছেন, তা জেনে আর কী লাভ। কিন্তু মালতীদি, আপনি তো আর নিতান্ত 'বাংলার বধূটি' নন, আপনার গুণযোগ্যতার অভাব নেই, কী দুঃখে এমন না-খেয়ে না-প'রে ম'রে-বেঁচে এই জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন ?'

'কী করবো ?'

'কী আবার। আগে ছিলেন না ? চাকরি করতে বাধা কী ? অবিশ্যি আমি জানি না, চাকরি আপনি করছেন কিনা, কিন্তু ঘরবাড়ি খাওয়া-দাওয়ার যে দীন দশা আমি দেখতে পাচ্ছি তাতে মনে হচ্ছে—'

'ঠিকই ধরেছিস্, চাকরি আমি করি না।'

'কেন করেন না ? একলা একটা মানুষ, কতটুকু লাগে আপনার ? নিজেকে নিয়েই দিব্যি নিজে ঘর সাজাতে পারেন।'

মালতীদি তার একদিকের ভুরু বাঁকা ক'রে এমন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন যে আমি যেন একটা অবাক-করা কথা বলেছি যা তিনি পূর্বে কখনো শোনেন নি, এমনকি ভাবতেও পারেন নি।

আমি বললাম, 'আর চাকরিও আপনার এমন-কিছু ফ্যালনা হবে না, বড়ো কাজই পাবেন আপনি।'

'বলছিস কী তুই, মণি ?' মালতীদি আকাশ থেকে পড়লেন,

'ওদের ঘরের বৌ হ'য়ে আমি চাকরি করবো ? তা হ'লে কি সে আমাকে আস্ত রাখবে ? চাকুরে মেয়ে ওর দু'চক্ষের বিষ। তাদের সে অসৎচরিত্র বলে।'

এবার আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সে কী ? ওর মতামতে আপনার কী এসে যায় ? ওর সঙ্গে আপনার কিসের সম্বন্ধ ?'

'হাজার হোক, আমার স্বামী তো।'

'স্বামী !' আমি তাজ্জব। মালতীদি বলছেন কী ? দুঃখে দুঃখে কী মাথা খারাপ হ'য়ে গেল ? আমার দিকে তাকিয়ে বুঝলেন আমার মনের কথা, চোখ নামিয়ে যেন খানিকটা কৈফিয়ত দিলেন, 'তুই ছেলেমানুষ, বুঝবি না। একদিন তো সুখেই রেখেছিলো। আর সত্যি বলতে আমাকে তাড়িয়েও দেয়নি, আমি নিজেই চ'লে এসেছি।'

আমি চুপ।

মালতীদি মাদুরের উপর আঙুল দিয়ে হিজিবিজি কাটলেন, 'সবই শুনেছিস যখন, গল্পের শেষটুকুও শোন।'

চুণ-বালি-খসা ভাপসা দেওয়ালে ছায়া পড়েছে আমাদের। ভূতুড়ে ছায়া। সেই-ছায়া দু'টোর দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম— 'শেষ তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'এটা তো উপসংহার। তার আগে আর-একটা পরিচ্ছেদ আছে।'

'তার জন্যে কোনো বিশেষ বর্ণনার দরকার নেই। শেষটুকুই আগের দিনের যথেষ্ট প্রমাণ।' মালতীদি সংকোচে ভরা গলায় বললেন, 'নারে, কয়েকটা দিন ভালোই কেটেছিলো। একেবারে উল্লেখ না-করার মতো নয়। নিউ আলিপুরে মস্ত বড় বাড়িতে ছিলুম, দাসদাসী, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কিছুরই অভাব ছিলো না। নরনারায়ণের প্রেমের অভাবও অনুভব করিনি কখনো। কেবল একটা জিনিস

আমাকে পীড়া দিতো, সেটা হচ্ছে তার প্রণয়ের মধ্যে কোনো সূক্ষ্মতা ছিলো না, অপেক্ষা ছিলো না, মাঝে-মাঝে প্রায় বর্বর মনে হ'তো।'

'বিচ্ছেদের কি তবে সেটাই কারণ ?'

'না।'

'তবে ?'

'সে কখনো রাত্রিবাস করতো না আমার সঙ্গে।'

'মানে ?'

'মানে, দিনের বেলাটা থাকতো, রাত্তিরেও থাকতো কিছুক্ষণ পর্যন্ত, কিন্তু বারোটার ও-পিঠে নয়।'

'আর আপনি সারারাত একা বাড়িতে ?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় যেতো ?

'জিজ্ঞেস করলে এক-একদিন এক-একরকম গল্প বানিয়ে বলতো।'

'আর আপনি তা-ই বিশ্বাস করতেন ?'

'তাই বিশ্বাস করতুম। একজন বয়স্ক লোক অমন বানিয়ে কথা বলতে পারে সেটাই আমার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত ছিলো।'

'তাই ব'লে কোনো সন্দেহও হ'তো না ?'

'প্রথম দিকে হ'তো না, কিন্তু শেষের দিকে তা নিয়ে কষ্ট পেয়েছি।'

'তারপর ?'

'তারপর আর কী ? এসব কষ্টের কি কোনো তারপর আছে ?' একটু ভেঙে পড়ে হাসলেন, 'এদিকে আমাকে কিন্তু একেবারে কড়া নজরে রাখতো। লোকের সঙ্গে মেলামেশা, বেরুনো, বেড়ানো সব বন্ধ। কখনো-কখনো নিজে মোটরে চড়িয়ে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে

যেতেন, এই যা। হয়তো বা একদিন নিউ মার্কেট গেলুম, চিড়িয়াখানায় গেলুম, শহরের বাইরে দূরে চ'লে গেলুম কোথাও—'

'এই অত্যাচার আপনি সহ্য করতেন?'

'অত্যাচার কী? আমি তো বেরুতে কোনো দিনই ভালোবাসি না। বেরুবো কখন? সকাল থেকে রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত সে তো নিজেই আছে সঙ্গে-সঙ্গে। তা ছাড়া সে-কথাটা আমি জানতুম না তখন।'

'তারপর?'

'বেশ কয়েক মাস এ-রকম অন্ধের মতোই কাটিয়ে দিলুম। হঠাৎ একদিন সকালে উদ্‌ভ্রান্ত চেহারায় এসে বললো, 'মালতী, কয়েকদিন ছুটি দিতে হবে আমাকে।'

আমি বললুম, 'কোথায় যাবে?'

'মামলা বেঁধেছে বাড়ি নিয়ে, বাবার সঙ্গেও নানারকম গোলমাল চলেছে, ভয়ানক অশান্তিতে আছি। ম্যানেজারবাবুকে নিয়ে তাই একবার মহালে যেতে হচ্ছে।'

অস্থির হ'য়ে বললাম, 'ক'দিনের জন্য?'

'এই তো দু'চারদিন। মোটরে যাচ্ছি, পারলে দিনের মধ্যে একবার যে ক'রে হোক দেখা ক'রে যেতে চেষ্টা করবো।'

'কত দূর যাবে?'

'মাইল চল্লিশেক।'

'আমি একা থাকবো?'

'কী হবে? সব আমার বিশ্বস্ত লোক'

'তার চেয়ে আমি তোমাদের বাড়ি গিয়েই থাকি না?'

'পাগল!'

'কেন, পাগল কী, গেলে কী হয়?

'বাবা আছেন না ?'

'বাবা কিছু বলবেন না, আর বললেই বা আমি তা শুনবো কেন ? আমার অধিকার নেই ?'

অধিকারের কথা নয় মালতী। এখন ভারি বিপদ। চারদিক থেকে শত্রুরা সব ছেঁকে ধরেছে। জমিদারির ব্যাপার তো জানো না।'

'যদি তা-ই হয় তাহ'লে আমাকেই বা একা এ-বাড়িতে রেখে যাবে কী ভরসায় ? তার চেয়ে ওখানেই ভালো না ? তোমাদের বিপদে নিজেকে নিয়ে এমন আলাদা হ'য়ে থাকতে আমার ভালো লাগছে না।'

'উপায় কী ?'

'নিরুপায়েরই বা কী আছে ?'

'বাবার সঙ্গে আমার যে-সব কথাবার্তা হয়েছে তার পরে আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারি না।'

'কী কথা হয়েছে ?'

'শুনে লাভ নেই ?'

'লাভ-লোকসানের কথাই ওঠে না। কী বলেছেন তিনি ?'

'বলেছেন, আমি যে একটা জাতগোত্রপরিবার-পরিচয়হীন মেয়েকে বিয়ে করেছি তা তিনি জানেন।'

'ভালোই তো। সত্যি যে পরিচয়হীন নই গেলে তাও জানবেন।'

'সেটা জানবার জন্য তাঁর কোনো আগ্রহ নেই।'

'তাই ব'লে আমাকে এ-রকম আলাদা ক'রে রাখবে ? তুমি থাকবে এক বাড়িতে আর আমি অন্য বাড়িতে ? কখনো কোনো স্বামী-স্ত্রী এ-রকম থাকে ?'

'তারও ব্যবস্থা হবে।'

'কী ব্যবস্থা হবে ?'

'বাবার সঙ্গে আমার সে-বিষয়েও কথা হয়েছে।'

'নিজের স্ত্রীর সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করাটা কি তোমার বাবার অনুমোদন-সাপেক্ষ ?'

'কক্ষনো নয়। তাই যদি হবে তাহ'লে আর তাঁর সঙ্গে আমার ঝগড়া কিসের ?'

'বেশ তো, কী ঝগড়া করেছো বা কী ব্যবস্থা করেছো সেটাই শোনাও না।'

'বাবা আমাকে তোমার জন্য ত্যাজ্যপুত্র করতে চেয়েছেন তা জানো ? বলেছেন, বিয়ে যদি করলেই তবে আমার পছন্দমতো মেয়েটিকে করলে না কেন ?'

'তুমি কী জবাব দিলে ?'

'জবাব দিলুম, তাঁর পছন্দের একটি নমুনা তো তিনি নিজেই দেখেছেন, এবার না-হয় আমার পছন্দটাই যাচাই ক'রে দেখুন একবার। চ'টে উঠলেন আমার কথা শুনে, জমিদারী মেজাজ ফেটে চৌচির হ'য়ে গেল। হুংকার দিয়ে বললেন—বেরিয়ে যাও সামনে থেকে। তক্ষুণি বেরিয়ে গেলুম সে-কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু পরমুহূর্তেই ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তোমাকে ত্যাজ্য করবো।'

'তুমি রাজি হ'লে না, এই তো ? ভাবছো গরিব হ'য়ে যাওয়ার চাইতে বিবাহিত স্ত্রীটিকেই বর্জন করা অনেক সহজ, না ?'

'ঠাট্টা করছো ?'

'ঠাট্টা করবো কেন ? তার পরেও যে-রকম ঘটা ক'রে মহাল-পরিদর্শনে বেরুচ্ছো তাতে তো তাই মনে হয়।'

'না।'

'কী না ?'

'আমাকে অত ছোটো ভেবো না।'

'এর মধ্যে আর ছোটো বড়োর কী আছে। আমার অভ্যেস তোমার মাত্র কয়েক মাসের, ধনরত্নের অভ্যেস তোমার জন্মগত।'

'অভ্যেসের প্রশ্ন নয়। মূল্যগত ভেদটাই বড়ো। কোটি টাকার বিনিময়েও কি আমি তোমাকে পাবো?'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, তাই। এটা তুমি জেনে রাখো, আমি যা-ই করি তোমার ভালোর জন্যই করছি। আমি জানি, আমার বাবা রাঘবেন্দ্রনারায়ণ একদিন নিজে এসে সেধে নিয়ে যাবেন তোমাকে।'

'সে-দিন কবে?'

'খুব সুদূর নয়। বৃদ্ধ বাপ, আমি ছাড়া কেউ নেই তাই তাঁর, এইটুকু অন্যায় আমি সহ্য ক'রে নিয়েছি; আর তাঁর জন্য তোমাকেও কষ্ট দিচ্ছি। যদি সেটাকে তুমি আমার কাপুরুষতা ব'লে মনে করো, তাহ'লে আমি নিশ্চয়ই—'

লজ্জিত হ'য়ে বললুম, 'না, না, তা নয়। বাবার উপর নিশ্চয়ই তোমার কর্তব্য আছে, একটু অপেক্ষা করলেই যদি সব গোল মিটে যায় তবে তা-ই ভালো।'

নরনারায়ণ খুশি হ'লো এ-কথায়, আদর করলো আমাকে, তারপর বিদায় নিল।

## ১১

এখানে থামলেন মালতীদি। তাঁর ঠোঁট দুটি থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো একবার। কী বলতে গিয়ে বলতে না-পেরে চুপ ক'রে রইলেন খানিকক্ষণ। বিন্দু বিন্দু ঘামে ভ'রে গেল তাঁর কপাল। হলদে গালে আগুনের আভা ছড়ালো। আমি রুমাল বার ক'রে

নিজের ঘাড় গলা মুছে নিয়ে জোরে-জোরে হাতপাখাটা নাড়তে লাগলাম। সহসা অদ্ভুত একটা নিস্তব্ধতা নামলো ঘরের মধ্যে। কলকাতা শহরে বাস ক'রে বহু বছর সে-রকম শব্দহীনতার সঙ্গে পরিচয় নেই। যেন দম আটকে এলো।

একটু পরে চোখ তুললেন মালতীদি, ঢোঁক গিলে বললেন 'বুঝলি, সেই যে ফাঁকি দিয়ে গেলো আর তার খোঁজ নেই।'

'ফাঁকি!'

'সব ফাঁকি। সব তার ফাঁকি। সেই ফাঁকি ধরতে আরো অনেক সময় কেটে গিয়েছিলো আমার। শেষে আস্তে-আস্তে মেঘ জমলো মনে। সন্দেহের বীজ চারদিকে অঙ্কুর মেললো।'

'তারপর?'

'তারপর একদিন সকালে দোতলার সোনার খাঁচা ছেড়ে নামলাম একতলায়, একতলা থেকে লনে, লন পেরিয়ে দারোয়ানের নিষেধ, শাসন, বাধা-বিপত্তি সব এড়িয়ে সোজা রাস্তায় বেরিয়ে ট্যাক্সি ধরলাম। নিউ আলিপুরের রাস্তাটি সুন্দর। এই রাস্তার বুক বেয়ে আরো কতবার কত জায়গায় গিয়েছি নরনারায়ণের সঙ্গে, তার মস্ত গাড়ির গহ্বরে কত কিছুর স্মৃতিই সঞ্চিত হয়েছে দিনের পর দিন। কিন্তু সেদিন সকালের মতো লাগেনি। কালো পীচ ঢালা প্রশস্ত রাস্তাটির উপর আর যেন কোনোদিন প্রথম সূর্যের নরম আলো অমন আলস্যে বিছিয়ে থাকতে দেখিনি। দু' পাশে বড়ো-বড়ো গাছ, গাছের ছায়ারা সুখী প্রতিবেশীর মতো এ ওর গলায়-গলায়। আলো-ছায়ার বুনোট পাটি। নির্জন রাস্তায় হু-হু ক'রে গাড়ি চলছিলো, হাওয়ার ঝাপট লাগছিলো মুখে, মা-র কথা মনে প'ড়ে গেল। মনে প'ড়ে গেল দেশের কথা, সুবর্ণকোটি নদীর কথা। এ-রকম সময়ে সেই নদীতে জল কম থাকতো, আমরা ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েরা

হাঁটুজলে নেমে স্নান করতাম, লাল গামছা দিয়ে মাছ ধরতাম। দারুণ হাওয়া বইতো সেখানে। ডুবিয়ে-ডুবিয়ে যখন চোখ লাল হ'য়ে যেতো, মা এসে জোর ক'রে তুলে বকতে-বকতে বাড়ি নিয়ে যেতেন। কোথায় সে-সব দিন? কত দূরে ফেলে এলাম? এই গাড়িটা যেমন ক'রে সব পেছনে ফেলে আমাকে নিয়ে আজ এগিয়ে চলেছে, ঠিক তেমনি ক'রেই মনের চাকায় ইস্টিম দিয়ে ভগবান আমাকে এখানে এনে দাঁড় করিয়েছেন। এর পরে আরো কতদূরে নিয়ে যাবেন তাই বা কে জানে। মাটির কাঁচা ঘরে শীতের ঠাণ্ডায় মেঝের উপর হোগলা বিছিয়ে, সেই হোগলার উপর কাঁথা পেতে শুয়ে মা আমাকে জন্ম দিয়েছিলেন। নাড়ি কাটতে-কাটতে হাতে নখে একরাশ ময়লা নিয়ে রাক্ষসীর মতো সদি দাই দাঁত মুখ সিঁটকিয়ে বলেছিলো—ইঃ, মেয়ে! মা হাসিমুখে বলেছিলেন, এই আমার সাতরাজার ধন এক মানিক। বেশি বয়সে সন্তান হয়েছিলো তাঁর। আমিই তাঁর প্রথম সন্তান। সেই আঁতুড় ঘরের মানিক আমি। আমিই একদিন সাগরপারের মানিক হ'তে গিয়েছিলাম। কোথায় দশ বছর বয়সে বিয়ে হ'য়ে, নাকে নোলক প'রে, কানে মাকড়ি দিয়ে, দশহাত চেলি কাপড়ে বুক পর্যন্ত ঘোমটা টেনে, কাঁদতে-কাঁদতে শ্বশুরবাড়ি যাবো—তা নয়, পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ ক'রে গেলাম ইস্কুলে। ইস্কুল থেকে কলেজে। একটা ডোবা থেকে মহাসমুদ্রের বিস্তার। ঠাকুমা রেগে গিয়ে বাবাকে বলে-ছিলেন, তোর মেয়ের এই লেখাপড়া রোগই একদিন কাল হবে। বাবা একগাল হেসে বলেছিলেন—কোনো-কোনো মানুষ তো কালকে ডিঙোতেই সংসারে জন্ম নেয়। এই রকম ক'রে বানর থেকে মানুষ হয়েছি, মানুষের বুদ্ধি হয়েছে, চেহারায় আবার ফুটেও উঠেছে সেই আলো।'

সেই কালকেই আমি ডিঙিয়েছি এতোকাল, তারপর এসেছি এখানে, যেখানে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরলে সব ধূ ধূ। সত্য শুধু নরনারায়ণের বিশ্বাসঘাতকতার যন্ত্রণা।

যখন গাড়ি এসে স্টোর রোডে থামলো, নেমে দাঁড়িয়ে ভালো ক'রে দেখে নিলাম নেম-প্লেটটা। তারপর টিপে-টিপে পা বাড়ালাম। বুকের ভেতরটা কিন্তু টিপটিপ করছিলো। মনে হ'লো ফিরে যাই, তারপর যার বাড়ি তার সঙ্গেই আসবো একদিন। মনেই হ'লো, কিন্তু থামলাম না। ট্যাক্সিটাকে বাইরে অপেক্ষা করতে ব'লে ফটক খুলে ভেতরে ঢুকলাম। বিশাল বাড়ি, চারপাশে তাকিয়ে বিশ্বাস করতে ভয় করলো এ-বাড়ি আমার। আমি আমার আপন অধিকারেই এ-বাড়ির মাটিতে এসে দাঁড়িয়েছি। এ-বাড়ির সারা অন্তর আমারই জন্য অপেক্ষা করছে এতোকাল ধ'রে। একেবারে নিস্তব্ধ পুরী, একটি লোক দেখতে পেলুম না আশে-পাশে, যাকে অবলম্বন ক'রে সাহস পাই একটু। ভাবলুম, যদি নরনারায়ণ না থাকে তা হ'লে কী করবো? ফিরে আসবো? না পরিচয় দেবো? যদি নরনায়ণের বাবা রাজা-বাহাদুরের মুখোমুখি প'ড়ে যাই, কী বলবেন তিনি আমাকে? তাড়িয়ে দেবেন? না সাদরে গ্রহণ করবেন কন্যাস্নেহে? বাগানে নানারঙের ফুল ফুটেছে, রোদ কাঁপছে মাথায়-মাথায়, প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে, ধীরে-ধীরে অর্ধচন্দ্রাকার ঘাস-মোড়া সবুজ মখমলের মতো নরম রাস্তা প্রত্যেক পদক্ষেপে অনুভব করতে-করতে এক সময়ে এসে বারান্দায় উঠলাম। একটা লোক ঝাড়পোঁছ করছিলো, অবাক হ'য়ে ফিরে তাকিয়ে বললো, 'কাকে চান?'

আমি যে এ-বাড়ির মালিক সেই অহমিকাটুকু অচেতনভাবেই

মনের মধ্যে বহন করছিলাম, বোধ হয় তাই জবাব না-দিয়ে গম্ভীর গলায় পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কী কাজ করো এখানে ?'

'আজ্ঞে আমি বেয়ারাদের হেড। আমি উদয়।'

বুঝলাম বিখ্যাত লোক। বারান্দা থেকে ঘরে ঢোকবার বিরাট দরজাটি অতিক্রম করলাম পর্দা সরিয়ে। লোকটিও পেছনে-পেছনে এলো। জিজ্ঞেস করলাম, 'কুমার বাহাদুর কি মহাল থেকে ফিরেছেন ?'

'মহাল ?' লোকটি ভুরু কুঁচকোলো, 'মহালে তো যাননি ?'

'যাননি ? যাবাব কথা ছিলো যে।'

'দাদাবাবু কেন মহালে যাবেন। সেজন্যে তো ম্যানেজারবাবুই আছেন।'

নিশ্বাসটা বড়ো হ'লো আমার। একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'তা হ'লে উনি বাড়িতেই আছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'কোন্ ঘরে থাকেন উনি ? আমাকে নিয়ে যেতে পারবে সেখানে ?'

'উনি যে এখনো অন্দর থেকে নামেননি। ঘুমুচ্ছেন।'

'ঘুমুচ্ছেন ? বেলা দশটায় তাঁর ঘুম ?'

'রাত জাগতে হয় কিনা ? তাছাড়া দাদাবাবুর ঘুমই অমনি।'

'রাত জাগেন কেন ?'

'ও মা, বৌ-রানীর যে খুব অসুখ। বাঁচবার আশাই ছিলো না। কদিন ধ'রে কত ডাক্তার, কত—'

'বৌ-রানী ? বৌ-রানী কে ?'

'আমাদের বৌ-রানী। দাদাবাবুর ইস্তিরি। তিনি যে এ-যাত্রা বেঁচে উঠেছেন, সে আমাদের কত ভাগ্যি।'

'দাদাবাবুর বৌ। তিনি এখানে? এ-বাড়িতে?'

'তবে আর তেনি কোথায় থাকবেন? তেনি না-থাকলে কি একদিন চলে? বুড়ো কর্তা তো বলতে গেলে বৌ-রানীর হাতেই সব ছেড়ে দিয়েছেন, আর ছেলেমেয়েরাও বড়ো হ'য়ে উঠেছে—' লোকটি বেশ জাঁকিয়ে গল্প ফাঁদতে বসেছিলো, আমি ব'সে পড়লাম সামনের লম্বা সোফাটায়, শূন্য দৃষ্টিতে কোন্ দেয়ালে যে তাকিয়ে রইলাম কে জানে।

'আরেকটি হ'তেই এই অবস্থা', লোকটি তার অসমাপ্ত বাক্য সাঙ্গ করলো, 'তা ছেলেও হ'য়েছে তেমনি। একেবারে রাজপুত্তুরের মতো।'

পাশের ঘরের পর্দা সরিয়ে একমাথা পাকা চুল, নিকেলের চশমা পরা ফতুয়া গায়ে এক বৃদ্ধ মুখ বার করলো। আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলো, 'কাকে চাই?'

আমার গলায় শব্দ ছিলো না। আমার চোখে সমস্ত জগৎটা চর্কির মতো ঘুরছিলো।

উদয় বললো, 'দাদাবাবুকে চাইছেন। বলছি, দাদাবাবুর এখনো ঘুম ভাঙেনি।'

'কী দরকার?'

বৃদ্ধটির প্রশ্নের ধরন যতো কর্কশ, চোখের দৃষ্টি তত তীক্ষ্ণ। যেন অন্তরের অন্তস্থল পর্যন্ত দেখে নিতে চায়। হঠাৎ আমার ভেতরকার আহত সাপটা কোমর সোজা ক'রে উঠে দাঁড়ালো। আমি যে কে সেই চেতনাটাই যেন গর্জে বললো, 'সেটা তো আপনাকে জানাবার বিষয় নয়। তা হ'লে আমি আপনার কাছেই আসতাম। আমি এসেছি আমার স্বামীর কাছে। আপনি দয়া ক'রে এ-খবরটা তাঁকে পৌঁছে দিলে বাধিত হবো।'

'কী।'

'আমি কুমার বাহাদুরের স্ত্রী মালতী দেবী চৌধুরানী।'

'স্ত্রী!' বৃদ্ধের পাকা মাথা নড়ে গেলো। উদয়ের ছোটো চোখ আরো ছোটো হ'লো। এক পলকে ওরা তাকিয়েছিলো আমার মুখের দিকে। ভেবে পাচ্ছিলো না এর পরে কী করবে, কী বলবে। কিন্তু সেই মুহূর্তে স্বয়ং কুমার বাহাদুর নিজেই ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে ঘরে এসে ঢুকলো। তার বেশভূষা দেখে বোঝা গেল সোজা বিছানা থেকেই উঠে এসেছে, পরনে রাত-কাপড় ছিলো। চোখে মুখে ঘুমের কাতরতা ছিলো। কোনো দিকে লক্ষ্য ছিলো না তার। বোধহয় অসুস্থ মানুষটির জন্য কোনো জরুরি তাগিদেই তাকে নেমে আসতে হয়েছে। অস্থির পায়ে ঘরে ঢুকে বিরক্ত গলায় বললো, 'এই যে সরকার মশাই, শুনুন আপনি গাড়িটা নিয়ে একবার বাথগেটে চলে যান্ তো, এই ইনজেকশনটা চাই।' প্রেসক্রপশনের কাগজটি এগিয়ে ধরলো সে, 'যদি সেখানে না পান স্মুর মেডিকেল স্টোর্সে যাবেন। যদি সেখানেও না পান তা হ'লে সোজা—' অনেকক্ষণ সহ্য করেছি, আর পারলাম না। প্রায় লাফিয়ে এসে মুখোমুখি দাঁড়ালাম। বিকৃত স্বরে বললাম, 'মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, তুমি এই?'

ঘৃণায় লজ্জায় দুঃখে আমার গলা আটকে আসছিলো। চমকে উঠে দু'হাত পেছিয়ে গেলো সে, গোল আর শাদা মুখটা কেমন বোকা-বোকা দেখালো, দু'পাশে দুটো মাংসল হাত তার ঝুলে পড়লো। আমি সেই হাত দুটো ধ'রে ঝাকানি দিয়ে বললাম, 'তুমি এতো জঘন্য? এতো নিকৃষ্ট?'

মুহূর্তে সে সামলে নিল নিজেকে, গালের দুধ-ধোয়া সুখী রং লাল দেখালো, আমি যে তার নিষেধ শাসন না-মেনে, চারদিকের আঁটঘাঁট সেপাই সান্ত্রী ডিঙিয়ে এমন ঘরকুনো আর বোকা স্বভাব নিয়ে সোজা

এ-বাড়িতে চলে আসবো এটা সে কল্পনাও করতে পারেনি। সরকার মশায়ের দিকে তাকিয়ে বললো কী, জানিস ? 'এই স্ত্রীলোকটি কে, সরকার মশাই ?' আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এতো বড়ো মিথ্যেটা অনায়াসে উচ্চারণ করলো সে। আর তখন আমার কী ইচ্ছে করলো ? ইচ্ছে করলো একটা চীৎকার দিয়ে আকাশ বাতাস ফাটিয়ে ফেলি। ঐ মস্ত বড়ো বাড়িটার দেয়াল চৌকাঠ খানখান হ'য়ে ভেঙে যাক সেই চীৎকারের চাপে। কিন্তু গলার স্বর ফুটলো না। সরকার মশাই মাথা চুলকে বললেন, 'আজ্ঞে, ইনি তো বলছেন—'

'ইনি কী বলছেন শুনতে চাই না। আপনারা যাকে-তাকে ফটক দিয়ে ঢুকতে দেন কেন, সেটাই জানতে চাই আমি। যতো সব পাগলের কাণ্ড—'

'তুমি আমাকে চেনো না ? চেনো না ? কাপুরুষ, হীন, নীচ, মিথ্যুক—'

প্রাণপণ শক্তিতে আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, কিন্তু ততক্ষণে সে ভেতরে চ'লে গেছে।'

দু'হাতে মুখ ঢেকে এখানে কেঁদে ফেললেন মালতীদি, আর আমার নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে যেন দাঁতে দাঁত লেগে গেলো। উত্তেজনায় হাতে হাত আঁকড়ে রুদ্ধস্বরে বললুম, 'আপনি তাকে খুন করতে পারলেন না ? আপনার পায়ে জুতো ছিলো না ? পাপিষ্ঠ ! লম্পট ! এর সাজা কী ও পাবে না মনে করছেন ? পাবে। পাবে।'

'আর সাজা। ভগবান যে কার পাপে কাকে সাজা দেন সে-কথা শুধু তিনিই জানেন।' জলভরা চোখে মুখ তুলে তাকালেন মালতীদি।

'কী আর করবো ? ট্যাক্সিটা ভাড়া না পেয়ে দাঁড়িয়েছিলো, কখন এসে আবার সেটাতেই চেপে বসলুম।'

'চুপচাপ ফিরে এলেন ?'

'চুপচাপ ফিরে এলাম।'

'কেন এলেন ?'

'কী করতে পারতাম ?'

'কী পারতেন না ? ওকে দাঁতে, নখে ছিঁড়ে ফেলতে পারতেন। যেতে পারতেন ওর বাপের কাছে। চীৎকার ক'রে জড়ো করতে পারতেন আমলা ফয়লা চাকর-বাকর সব গুষ্টিকে। ওর মুমূর্ষু স্ত্রীকে জানাতে পারতেন তার স্বামীর কীর্তি।

'পারিনি। পারিনি। কিছুই পারিনি, মণি। আমি কিছুই পারি না। জীবনে কারো সঙ্গে কখনো গলা তুলে একটা তর্কও করতে পারিনি কোনোদিন। রাগ হ'লে, দুঃখ হ'লে শুধু চুপ ক'রে জ্ব'লে-পুড়ে মরেছি তবু কাউকে বলতে পারিনি কিছু। আমি এই রকমই। এই আমার স্বভাব। আমার দুর্বলতা।'

'কোনোদিন পারেননি ব'লে সেদিনও পারলেন না ? সব অপমান নিঃশব্দে স'য়ে ফিরে এলেন ?'

'সইতেই হ'লো। সে-ই যখন আমাকে স্বীকার করলো না, তখন আর—'

'স্বীকার করা না-করার কথা নয়, আপনি যে কে, আপনার কথা যে সত্য সেটা তো প্রমাণ হ'তো। আর ঐ ভদ্রমহিলা, যার অসুখে বুক ফেটে যাচ্ছে লোকটার, সে তো সব জেনে ঘৃণা করতে পারতো তার স্বামীকে।'

'ভদ্রমহিলার কী দোষ ?'

'দোষগুণের কথা নয়। ভদ্রমহিলার জানা উচিত কী ভুলের মধ্যে সে বাস করছে। কী তার স্বামী।'

'ভুল তো ভালোই। ভুলের মধ্যেই তো আমরা সারা জীবন বেঁচে থাকি। ভুল না-থাকলে আর রইলো কী। এই ধর না

আমিও যদি সেদিন না যেতুম ওখানে, অবিশ্বাস না-করতুম, নিজের ভুল নিয়ে নিজে মুগ্ধ হ'য়ে বেশ তো সুখেই থাকতে পারতুম। ভুলটা ভাঙলো ব'লেই তো এতো কষ্ট।' মালতীদি উঠে গিয়ে কুঁজো থেকে দু'চাপড়া জল দিয়ে এলেন মাথায়, আঁচল দিয়ে মুছতে-মুছতে বললেন, 'আজকাল হয়েছে কী জানিস, মাথাটা কেমন গরম হ'য়ে ওঠে থেকে-থেকে। যেন কেমন ক'রে ওঠে।'

'মাথার আর দোষ কী?'

'তাই তো।' মালতীদি হাসলেন। আমার হাত থেকে পাখাটা টেনে নিয়ে বললেন, 'হওয়াটা কেমন বন্ধ হ'য়ে গেল, না রে?'

আমি ঈষৎ অবাক হ'য়ে বাইরে বাতাসের শাঁ শাঁ শব্দ শুনতে-শুনতে বললাম, 'কই, না তো? আজ তো খুব হাওয়া।'

'তাই নাকি? ঐ ছাখ আবার আমার সে-রকম হ'লো।'

'কী রকম?'

'মনে হচ্ছে নিশ্বাস নেবার মতো হাওয়াটুকুও যেন নেই পৃথিবীতে।'

'এতো গরম লাগছে আপনার?'

'সেদিন ট্যাক্সিতে ব'সে ফিরে আসতে-আসতেই প্রথম এ-রকটা হয়েছিলো। মনে হচ্ছিলো শরীরটা যেন একটা অসীম শূন্যতার মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে, কোথাও নিশ্বাস ফেলার মতো এতোটুকু অবলম্বন নেই। ভেবেছিলাম গাড়ির মধ্যেই বুঝি দম আটকে ম'রে প'ড়ে থাকবো। কিন্তু আস্তে-আস্তে নিজে থেকেই কেটে গেলো সেই ঘোর। পরে অবিশ্যি নরনারায়ণ ডাক্তার দেখিয়েছিলো।'

'নরনারায়ণ? তারপরেও নরনারায়ণের সঙ্গে ছিলেন আপনি?'

মালতীদি চোখ নিচু করলেন। আমার হাতটা নিজের মুঠোয়

টেনে নিয়ে ভেজা গলায় বললেন, 'বাড়ি এসে গুছিয়ে নিয়েছিলুম সব। ভেবেছিলুম এ-বাড়িতে থাকার গ্লানির চেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরা ভালো। কিন্তু সে যে পিছনে-পিছনে এসে হাজির। বলে, ক্ষমা করো!'

'উঃ, কী নির্লজ্জ।'

'কেঁদে-কেটে হাতে-পায়ে ধ'রে—'

'ছি ছি!'

'বললো, তুমি চ'লে গেলে আত্মহত্যা করবো।'

'আত্মহত্যা! ও করবে আত্মহত্যা! ঘরে-ঘরে তবে সর্বনাশ করবে কে? স্কাউণ্ড্রেল। লম্পট। কিন্তু মালতীদি, আপনি কী। আপনার দেহে কি রক্ত নেই, মাংস নেই? মান-সম্মানবোধ কী আপনার এতোই বোবা?'

'রাগ করছিস?'

'করবো না? আমি আপনার মতো নই। আমার এ-সব শুনতেও অসহ্য বোধ হচ্ছে!'

'আমারই কি হয় না? কত যে হয় কাকে বলি?'

'তার কী প্রমাণ আপনি দিয়েছেন? আপনার চেহারায় তার কতটুকু চিহ্ন আছে?'

'আছে রে, আছে। নিজেকে শাস্তি দিতে কি আমি কম দিই?'

'নিজেকে! নিজেকে কেন? শাস্তি দেবেন তাকে। সেই পাষণ্ডটাকে। যে আজ আপনাকে এই সর্বনাশের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। সে আত্মহত্যা করলে আপনার কী হ'তো? পৃথিবীর পাপ কমতো একটা।'

'জানি। সব জানি। তবু যে কেন লোকটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারি না মন থেকে কে জানে। এক মিথ্যা ঢাকতে সেদিন নর-

নারায়ণ যখন আরো শত শত মিথ্যার জাল বিস্তার করলো আমার কাছে, আমি বুঝে-সুঝেও মূর্খ পাখির মতো আবার ধরা দিলাম সেই জালে। ও বললো, ওদের বাড়ির লোকেরা যদি সেদিন আমাকে চিনতে পারতো তাহ'লে বিষ খাওয়াতো আর সেই ভয়েই ও চেনে না ব'লে স'রে গিয়েছিলো। আমি বিশ্বাস করিনি সে-কথা, কিন্তু তবু কী জানি কিসের মোহে মেনে নিয়েছিলুম। ওর স্ত্রী ঐন্দ্রিলা দেবী সম্বন্ধে ওদের বেয়ারা আমাকে যে সব খবর দিয়েছিলো তা-ও যে সব মিথ্যে, এ-কথাটাও নরনারায়ণের মুখ থেকে আমি ধৈর্য ধ'রে শুনেছিলুম। তুই বলবি কী, মণি, সে-সব কথা ভাবলে নিজের উপরে আমার নিজেরই ঘেন্না ধ'রে যায়।'

'বলেছিলুম, যদি বিষ খাওয়ায় খাওয়াক, কিন্তু এ-ভাবে এ বাড়িতে আর আমি আলাদা বাস করবো না। যদি সসম্মানে তোমার পৈতৃক বাড়িতে নিয়ে তুলতে পারো তবে চলো, নয়তো এই শেষ।' বললো, 'কেন, এটাও কি আমার বাড়ি নয়?' আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই তোমার বাড়ি, তবে বাগানবাড়ি। যেখানে তোমাদের মতো জমিদারপুত্ররা তাদের স্ত্রীলোক রাখে। আমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী।'

'কী জবাব দিলেন আপনার স্বামী?'

'জবাব দিলেন, তা-ই হবে। তবে একটু অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষাই করেছিলুম, মণি, কিন্তু তাও তার মিথ্যা, বুঝতে পারলাম সে-অপেক্ষার কোনোদিন শেষ হবে না। তারপর চ'লে এলাম একদিন।'

'আর এসেও তার নামই জপ করছেন। এখনো ভাবছেন তার অনুমতি ছাড়া আপনার এক পা-ও নড়া উচিত নয়। ছিঃ! আপনার লজ্জা হওয়া উচিত, মালতীদি।'

'ধিক্কার তুই একশোবার দিতে পারিস। কিন্তু, মণি, হৃদয় যে বড়ো অবুঝ। ভালো হোক, মন্দ হোক, একবার নিজেকে সমর্পণ করলে আর কোনো উপায় থাকে না। আর মুক্তি মেলে না তা থেকে। আমি যে লোকটাকে ভালোবাসি।'

'ভালোবাসেন! ঐ লোকটাকে!' আমি স্তব্ধ হ'য়ে গেলাম কথা শুনে। হায় রে অবোধ ভালোবাসা।

অবশ্যি ভালোবাসার এই রূপ মালতীদির নতুন নয়। এই সর্বনাশা ভালোবাসার সুযোগ রমেনও কম নেয়নি তাঁর কাছ থেকে। কিন্তু তবু তাতে প্রলেপ ছিলো, সবটাই তবু ফাঁকি ছিলো না, রমেন আর যাই হোক, যতক্ষণ ভালোবাসতো ততক্ষণ মনেপ্রাণেই একনিষ্ঠ থাকতো তার প্রণয়িনীর প্রতি। তারপর যেদিন মন বদলাতো, ছেড়ে-ছুড়ে চ'লে যেতো দূরে। প্রবঞ্চনা দিয়ে দেহ ভোগ করতো না। অসৎ ছিলো না সে। শরীরের ক্ষুধা সে মনের ক্ষুধাকে বাদ দিয়ে ভাবতো না। কিন্তু নরনারায়ণ। ছি!

আমি মালতীদির দিকে একপলকে তাকিয়ে রইলুম! সুন্দর, সরল একখানা পবিত্র মুখ। দেখতে-দেখতে ভেবে পেলুম না এই মানুষকে কেমন ক'রে লোকে ঠকাতে পারে।

লণ্ঠনটা তেলের অভাবে দপদপ করছিলো, আমাদের ভূতুড়ে ছায়া দু'টো যেন স্প্রীংয়ের পুতুলের মতো নাচছিলো দেয়ালে। ভেজানো দরজাটা খুলে হা-হা ক'রে এক ঝলক হাওয়া ঢুকলো ঘরে, ভাঙা জানালাটা কঁকিয়ে উঠলো। বেদনার্ত মালতীদিকে সহসা আমি দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে বললুম, 'এভাবে আর কতদিন কাটবে?'

'ঈশ্বর জানেন।' মালতীদি তাঁর সিলিংয়ের ঘুণে খাওয়া কড়ি-কাঠের দিকে দিকে তাকালেন, ঈশ্বরকে খুঁজলেন বোধহয়। তারপর

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তিনটে মাস তো এ-ভাবেই কেটে গেল।'

রাস্তা দিয়ে বিকট চীৎকারে হল্লা করতে-করতে মড়া নিয়ে গেলো একদল লোক, আমি সভয়ে চারিদিকে তাকালাম, খড়খড় ক'রে আরশোলা উড়লো, পাখার ঝাপটায় সেটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে মালতীদি হাসলেন, 'যেমনি হরিধ্বনির উৎপাত তেমনি আরশোলার যন্ত্রণা। তোর বুঝি ভয় ঢুকে গেল? নিশ্চয়ই আর কখনো এমুখো হবি না।'

গা ছমছম করছিলো আমার, জানালার নিবিড় অন্ধকারে চোখ রেখে বললাম, 'না। আপনিও আমার সঙ্গে চলুন।'

'তোর সঙ্গে? তা তো যাবোই। ট্রাম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবো তোকে।'

'ট্রাম পর্যন্ত বলিনি, বাড়ি পর্যন্ত আপনাকে নিয়ে যাবো আমি। যতোদিন অন্য কোনো সুবিধে না হয়, আমার ওখানেই আপনাকে থাকতে হবে।'

'পাগলি।' মালতীদি আদর করলেন আমাকে, 'এতো ভাবছিস কেন তুই? আচ্ছা বোকা তো। আমার কিন্তু এখানে বেশ লাগে।'

'সে-সব আমি শুনবো না।'

একটু চুপ ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে মালতীদি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। 'দেখিস, ও ঠিক আসবে। ঠিক এসে আমাকে নিয়ে যাবে। কিছুতেই আমাকে থাকতে দেবে না এখানে।'

'এখনো আপনার আশা গেলো না?'

'আশা কি যায়? আশা গেলে আর থাকবে কী রে?'

' বে আপনার কঙ্কাল। নরনারায়ণ যা নেবার নিয়েছে,

আর তার কোনো দরকার নেই আপনার কাছে। কথাটা নিষ্ঠুর ঠিক। আপনি শক্ত হোন মালতীদি।'

'তুই ভাগ্য মানিস না কেন? যার ভাগ্যে যতোদিন কর্মভোগ তা তো হবেই।'

'আপনিই বা পুরুষকার মানেন না কেন? ভাগ্য তো পুরুষকার ছাড়িয়ে নয়। আলো-আঁধারের মতো ওতোপ্রোতভাবে জড়ানো।'

'আমি যুদ্ধ করতে পারি না মণি। ভেসে চলাই আমার স্বভাব। তাই ব'লে একদিন কি তরী ভিড়বে না কোনো ঘাটে?' বলতে-বলতে মালতীদির গলাটা ভেঙে এলো, পরমুহূর্তেই কেমন অন্য রকম হ'য়ে গিয়ে বললেন, 'শকুন্তলার কথা ভেবে ছাখ—'

'শকুন্তলা! সে কে?'

'কালিদাসের শকুন্তলা। অত প্রেম, অত প্রণয়, কী হ'লো তারপর? দুষ্মন্ত চিনতেই পারলো না তাকে। ভাগ্যের অভিশাপ। আমার ভাগ্যে কখন কার অভিশাপ লেগেছে কে বলবে। শেষে তো কত দুঃখ বিরহের পরে মিলন ওদের হ'লো?'

মালতীদি বলছেন কী? মাথা-খারাপ হ'লো নাকি? আমি চুপ ক'রে তাকিয়েছিলাম। মালতীদি চোখ বড়ো-বড়ো ক'রে আবার বললেন, 'আর তুই নল-দময়ন্তীরই কথাই ভাব না। ভাগ্য। ভাগ্য। সব ভাগ্যের লীলাখেলা। কে ঠেকাবে তাকে? কোন পুরুষকারের এত শক্তি আছে যে ভাগ্যকে এড়িয়ে যাবে?'

এবার আমি উঠে দাঁড়ালাম, দরজার দিকে আসতে-আসতে বললাম, 'তবে তা-ই থাকুন, দেখুন ভাগ্য আপনাকে কোন্ স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আমি আজ চলি।'

মালতীদি বাইরে এসে রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে আমার পিঠের উপর হাত রাখলেন, বললেন, 'আকাশটাকে দেখ কী কালো।

তোর কী মনে হচ্ছে না এই কালো অনন্ত? অনন্তকাল ধ'রে এই আঁধারেই বাঁচতে হবে আমাদের? অথচ রাতটুকু কাটলেই তো মস্ত লাল গোল সূর্যের আগুন ধুয়ে দেবে সব অন্ধকার। সব দুঃখ মুছে দেবে আলোর বন্যায়। কোথায় থাকবে এই হতাশার বোবা বেদনা। এই অন্ধকারের নাড়ি ছিঁড়েই তো সূর্যের জন্ম।'

কী অদ্ভুত বিশ্বাস। আমি চুপ।

'তাই বলছি তুই ভাবিসনে। সব একদিন ঠিক হ'য়ে যাবে। রাত কাটিয়ে সূর্যের দেখা আমিও পাবো। ও আসবে। আসতেই হবে। কেবল কী মনে হয় জানিস?' এখানে মালতীদির গলা আবার সহজ হ'য়ে ধ'রে এলো, 'যদি কোনোরকমে একটা বাচ্চার মা-ও হ'তে পারতুম—'

১২

বাড়ি এসে সেই রাত্রে একবিন্দু ঘুমুতে পারিনি আমি, একবারের জন্য ভুলে যেতে পারিনি মালতীদির কথা। চোখ যতোবার তন্দ্রায় ভেঙে এসেছে ততোবার বিশ্রী-বিশ্রী স্বপ্ন দেখে ঘেমে জেগে উঠেছি। ভয়ে ধুক্‌ধুক করছে বুকের ভেতরটা, বিষাদে মন ভ'রে গেছে।

আমার দিগ্বিজয়ী ব্যারিস্টার স্বামীকে বলেছিলাম একটা মামলা ক'রে দিতে, বলেছিলাম লোকটাকে সকলের কাছে অপদস্থ করার সব উকিলি ফন্দি বার করতে। তিনি রাজি হননি। খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে মুখ তুলে মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'উল্টো সাক্ষী দিয়ে তোমার মালতীদি শেষে আমাকেই ফ্যাশাদে ফেলবেন। যে-স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তিনি একটা চাকরি পর্যন্ত করতে পারেন না, সে-স্বামীর নামে মামলা করবেন এ-কথা ভাবাটা নিতান্তই

ছেলেমানুষি। আর তাছাড়া, যাই বলো, ভদ্রমহিলার মাথারও একটু গোলমাল আছে।'

'কী!' তৎক্ষণাৎ আমি ভ্রূকুটি করলাম। আমার পুরোনো দোষ, কে না জানে যে আমি নিজে যা-ই ভাবি না কেন, বলি না কেন, আর কারো মুখ থেকে মালতীদির প্রতি এতটুকু অশ্রদ্ধা আমি সইতে পারি না।

কয়েকদিন পরে কোনো-এক অপরাহ্নে যখন জ্যৈষ্ঠের লম্বা বেলা যাই-যাই করেও গাছের মাথায়, পাতার ফাঁকে ফাঁকে, এ-বাড়ি ও-বাড়ির ছাদে, অন্দরে জানালার শিক গলে লাল সিমেণ্টের মেঝেতে তার স্তিমিত জ্যোতি নিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিলো জেদি ছেলের মতো, আর আমি সবে দিবানিদ্রা সেরে বৈকালিক চায়ের আয়োজনে ব্যস্ত, এমন সময় রোদে গরমে লাল হয়ে মালতীদি এসে হাজির। আমি রান্নাঘরের দরজা ছেড়ে বসার ঘরে এলাম। 'ও মা, আপনি! আমি আজই ঠিক আপনার কথা ভাবছিলাম।'

'ভাবছিলি বুঝি?' মালতীদি ছোট্ট রুমালে মুখ মুছে হাসলেন, 'সে-কথাটা কি আমাকে দেখে মনে পড়লো?'

'বাঃ, তা কেন?'

'তবে যাসনি কেন?'

'বললে তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আজ আমি যাবার কথাই ভাবছিলাম।'

'জানিস, আমি তোর জন্য রোজ আশা ক'রে বসে থাকি? তুই আসবি বলে ভালো চা কিনেছি, স্টোভ সারিয়েছি, এক টিন বিস্কুট পর্যন্ত এনে রেখেছি। সেদিন তোকে কিছু দিতে না-পেরে আমার যা কষ্ট হয়েছিলো।'

'কী আশ্চর্য! আপনার কাছে আমি তো আপনার জন্যেই যাবো। তার জন্য আবার উপকরণ লাগবে নাকি?'

'উপকরণ একটু চাই-ই জীবনে। ওটা অলংকার। প্রিয়সঙ্গ আরো প্রিয় করে তুলতে এক কাপ চা কি কম ভাবিস তুই?'

পাখা ছেড়ে দিলাম। বললাম, 'বসুন, ঠাণ্ডা হোন। বাইরে তো বোধহয় এখনো আগুন জ্বলছে। কত কষ্ট হয়েছে আসতে।'

'কষ্ট কী রে? এক গ্লাশ জল দে।'

'নিশ্চয়ই।' জল নিয়ে এলাম তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি খাবার তৈরির জন্য একটা তাগিদ দিয়ে এলাম রান্নার লোকটিকে, কাছে বসে বললাম, 'নতুন খবর কী বলুন।'

'নতুন খবর একটু আছে', মালতীদির হাতে একটা প্যাকেট ছিলো, তা থেকে একটি বই বার ক'রে টেবিলের উপরে রাখলেন, 'তোকে বলেছিলুম জীবনী লিখেছি একটা, তার প্রথম খণ্ডটা এই আজই নিয়ে এলাম প্রেস থেকে। তোদের দিতে এলাম।'

বইখানা হাতে নিয়েই উৎসর্গের পাতাটায় আমার চোখ থামলো, 'তা হ'লে স্বামীকেই—'

মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে মালতীদি একটু বেশিরকম সপ্রতিভ-ভাবে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, স্বামীকেই উৎসর্গ করলাম। আশা করি এবার আর সম্পর্কটাকে অস্বীকার করতে পারবে না। হাজার হোক, ছাপার অক্ষর তো। ভালো বুদ্ধি করিনি?'

'কী জানি—'

আমার উদাস ভঙ্গিতে মালতীদি ভুরু কুঁচকোলেন, 'কী জানি বললি কেন? বল, নিশ্চয়ই। তোরা আমাকে যতো বোকা ভাবিস আসলে আমি যে সত্যি ততটা নির্বোধ নই সেটা অন্তত স্বীকার কর।

দশজনকে কথাটা জানাবার এর চেয়ে ভালো উপায় আর তুই কী ভাবতে পারিস্।'

'জানা না জানায় আর কী বা এসে যাচ্ছে।'

'কী না? মান-সম্মান বজায় রাখতে হবে তো?'

'আর মান-সম্মান। আপনার দুঃখ কি তাতে একতিল কমবে?'

'আমার দুঃখ!' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন মালতীদি, 'বলেছি তো যতোদিন ভোগ আছে—'

অসহিষ্ণু হ'য়ে বললাম, 'মামলা করবেন বলেছিলেন, সেটা করুন, সব ভোগ একদণ্ডে কেটে যাবে। স্ত্রীর অধিকার বই লিখে কেঁদে-কেটে উৎসর্গ ক'বে জানানোব চাইতে ওর মতো মানুষকে আইনের সাহায্যে জানালেই কাজ হবে বেশি।'

'তোর বুঝি তাই ধারণা?'

'আপনি নিজেই তো সে-কথা বলেছিলেন।'

'ও, সেদিনের কথা বলছিস?'

'আমি ফিরে এসে আমাব স্বামীকেও বলেছি।'

'কী বললেন?'

'বললেন, আপনি শেষে না উল্টো সাক্ষী দিয়ে বসেন এটাই তাঁর একমাত্র ভাবনা।'

'উল্টো সাক্ষী দেবো কেন?'

'বলা কি যায়?' বিদ্রূপ না-ক'রে পারলুম না, 'যে-রকম পতিপ্রাণা।'

'পতিপ্রাণাই বটে।' ব্যথিত মুখে মালতীদি হাসলেন, তারপর ছটফটিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আজ চলি, বুঝলি?'

'এখুনি?' আমি অবাক।

'অনেক জায়গায় যেতে হবে।'

'তাই বলে একটু বসবেন না, এই তো এলেন।'

'আজ ছেড়ে দে।'

'চা খেয়ে যান অন্তত।'

'না না, অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

'স্বামীর সঙ্গে মামলার কথা বললাম বলেই কি রাগ করে চলে যাচ্ছেন ?'

'কী যে বলিস।'

'আমার কিন্তু তা-ই মনে হচ্ছে।'

'সে-বিষয়ে আমি ভাবছিই না। আমি ভাবছি বইটা দেখে ও কী বলবে।'

'ছাই বলবে।' মালতীদির আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে আমি ঠোঁট বাঁকিয়ে বললাম, 'তাকিয়ে দেখবার আগেই সব কিনে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলবে।'

'কিনে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলবে ?'

'বাধা কী ? ক' কপি ছেপেছেন ?'

'পাঁচশো।'

'পাঁচ সিকে দামের পাঁচশো কপি বই কিনে ফেলতে ওর আটকাবে কোথায় ?' মালতীদি চুপ ক'রে রইলেন। আমি বললাম, 'আর তাছাড়া এ-বই ওর চোখেই পড়বে না হয়তো।'

'কেন পড়বে না ?'

'না-ও তো পড়তে পারে।'

'আমি নিজে হাতে ক'রে দিয়ে আসবো।'

'আপনি নিজে যাবেন এই বই নিয়ে ?'

'দোষ কী ?'

'না, দোষ আর কী।'

'তাই বলে তুই ভাবিস না ওর বাড়িতে যাবো আবার।' যেন সান্ত্বনা দিলেন আমাকে। 'অত ইয়ে নয়। ওর এক বন্ধুর বাড়ি রোজ বিকেলবেলা তাস খেলতে আসে, সেখানে যাবো। বইটাও দেবো, দুটো ভালোমন্দ কথাও শুনিয়ে দিয়ে আসবো আচ্ছা ক'রে।'

'তা হ'লে তাই যান।' আমি গম্ভীর হ'য়ে উঠে দাঁড়ালাম।

'সেটাই ঠিক হবে, কী বলিস?'

'আমি কী ক'রে জানবো, বলুন। ও-সব আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমার কিছু না-বলাই উচিত।'

'এটা তোর রাগের কথা।'

'রাগ করবো কেন?'

'সবাই করছে, আর তুই-ই বা কেন বাকি থাকবি। অথচ এ-কথাটা কেউ ভেবে দেখছে না লোকটার সঙ্গে যদি ঝুপ ক'রে একটা মামলা ক'রেই ফেলি, তার অর্থটা তো এ-ই দাঁড়ায় যে আর আমার তার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রইলো না। সম্পর্কটাকে উপড়ে ফেলা কি এতই সহজ?'

এর পরে আর কী বলা যায়? মালতীদি ধীরে-ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে চ'লে গেলেন, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে মনে-মনে বললাম, 'পরের বিষয়ে নিজের মাথা না-গলানোটাই বুদ্ধিমানের কাজ। মালতীদির ভালোমন্দ তাঁর নিজের, আমার নয়, আমি আর তাঁর বিষয়ে কখনো কিছু ভাববো না।'

## ১৩

অবিশ্যি ভাবতেও হ'লো না। সেই যে তিনি গেলেন আর একমাসের মধ্যে এলেন না। আমিও গেলুম না। লাভ নেই গিয়ে।

তাঁর অবস্থা জানি, তাঁর স্বভাবও জানি। মিছিমিছি মেজাজ খারাপ, মনও খারাপ হ'য়ে যায়। তাঁর ভালোবাসার জোরে তিনি সবই সইতে পারেন, হয়তো বা তাঁর এই নিষ্ঠা প্রশংসনীয় কিন্তু আমার ভালো লাগে না। রাগ হয়। এ-বিষয়ে তাঁর আদর্শ আর আমার আদর্শ সম্পূর্ণ আলাদা, আমি তাঁর জগৎ থেকে এ-বিষয়ে একান্তই অন্য মানুষ। তবে আর কী হবে গিয়ে ?

আমার স্বামী একদিন বললেন, 'তোমার মালতীদির খবর কী ?'

বিরক্ত হ'য়ে জবাব দিলুম, 'জানিনে।'

'আর তো এলেন না ?'

'না-আসাই ভালো।'

'রাগ করছো কেন ?'

'রাগ আবার কী ? মালতীদির মতো মানুষের কষ্ট পাওয়াই উচিত।'

'বইখানা কিন্তু সুন্দর লিখেছেন। পড়ছিলাম, ভালো লাগলো।'

'ঐ পারেন শুধু।'

'নিতান্ত কম পারা নয়। মহিলার জন্য আমার দুঃখ হয়।'

'আমার হয় না।'

'একদিন তো গেলেও পারো।'

'আমার আর খেয়ে-দেয়ে কাজ কী।'

সেই প্রসঙ্গে ছেদ টেনে অন্য কাজে মন দিলুম। দিলুম বটে, কিন্তু মন থেকে মানুষটাকে যে কেন মুছে ফেলতে পারি না কে জানে।

কয়েকদিন পরে হঠাৎ দমকা হাওয়ার মতো আবার মালতীদি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত।

'তোর স্বামী কোথায় রে ?' দারুণ ব্যস্তসমস্ত প্রশ্ন। তখন

জ্যৈষ্ঠ মাস নয়, আষাঢ়ের মাঝামাঝি। সেদিন মালতীদি লম্বা বেলার রোদ্দুরে জ্বলতে-জ্বলতে আসেননি, বর্ষার টিপটিপ অবিরাম বৃষ্টিতে ভিজে-ভিজে এসেছেন। বেলা চারটেতেই আলো ক'মে গেছে ঘরের, মনে হচ্ছে এরি মধ্যে রাত নেমেছে বুঝি। মেঘলা বিকেলের সেই ধূসর আলোয় মালতীদির দিকে তাকিয়ে দেখলুম চোখে মুখে দারুণ উত্তেজনা। পরনের শাড়িটা তাঁর আধময়লা, ভিজে গিয়ে সেঁটে বসেছে শরীরে, চুলগুলো এলোমেলো, পায়ের জুতোজোড়া কাদা মাখা। সবটা মিলিয়ে অত্যন্ত দীন দেখাচ্ছিলো।

'এই বৃষ্টিতে?' রাগ ভুলে ব্যস্ত হ'য়ে তাড়াতাড়ি তোয়ালে এনে দিলুম—'শীগ্‌গির মুছে ফেলুন। শাড়িটা ছাড়ুন।'

'কিচ্ছু দরকার নেই। তুই বোস। অসিতবাবু বাড়ি আছেন কিনা আগে সে-কথা বল।'

'উনি তো এখনো কোর্ট থেকে ফেরেননি। কী হয়েছে?'

'কী হয়নি? বাড়িওলা বার ক'রে দিয়েছে, মুদি ধার দিচ্ছে না, ধোপা কাপড় আটকে রেখেছে, একফোঁটা কেরোসিন ঘরে নেই যে আলো জ্বালাবো। এমন কি, কোথাও যে যাবো তার ট্রামভাড়াটি পর্যন্ত নেই। আর তারপরেও জিজ্ঞেস করছিস কী হয়েছে?' চোখ দুটো ছোটো ক'রে তিনি এমন তির্যকভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন যেন সে-সবের জন্যে আমিই দায়ী। একটু নিষ্ঠুর হ'য়ে বললুম, 'স্বামীর জন্য এইরকম কৃচ্ছ্রসাধন সতীলক্ষ্মীরা তো চিরকালই ক'রে থাকেন। হাজার হোক, পতি হলেন পরমগুরু, গুরুর গুরু মহাগুরু, ইহলোক, পরলোক দুই লোকেরই একাধিপতি। এর মধ্যে আর অসন্তোষের কী থাকতে পারে?'

খড়ের আগুনের মতো দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠে স্বভাববিরুদ্ধভাবে রেগে গিয়ে বললেন, 'টিটকিরি দিচ্ছিস, না? তা তো দিবিই।

তোর স্বামীর কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি যে। ঠাট্টাটা তাই তো এতো সহজে করতে পারলি।' ব'সে ছিলেন, উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ঠিক আছে। আমার যে কেউ নেই তা তো আমি জানিই, তবু মাঝে-মাঝে ভুলে যাই কথাটা।'

অপ্রস্তুত হ'য়ে তাড়াতাড়ি হাত ধ'রে বিনীত অনুরোধে বসিয়ে দিয়ে নরম গলায় বললাম, 'রাগ করছেন? অবস্থাটা তো আপনি নিজেই এখানে এনে ফেলেছেন। তাই বলছিলুম—'

'তাই বলছিলি যে নরনারায়ণের ইচ্ছেমতো রক্ষিতা হ'য়ে ওর আলিপুরের বাগানবাড়িতে গিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করি, না? তা হ'লে তো আর কোনো ভাবনা থাকে না, খেতেও পাবো, আর মাথার উপর ইটের আচ্ছাদনও থাকবে। আমাকে তোরা ভাবিস কী?'

অবাক হ'য়ে বললাম, 'আমি কেন সে-সব বলবো? বলেছি কখনো? আপনি যদি আমার কথা শোনেন তা হ'লে আমি এখন আপনাকে ওর বিরুদ্ধে মামলা করতেও বলবো না। কারণ আমি ভেবে দেখেছি নরনারায়ণের টাকার জোর এত বেশি যে মামলা করলেও সহজে তাকে কাবু করতে পারবেন না। হয়তো বা আপনাকেই দশের কাছে অপদস্থ হ'তে হবে। যে শয়তান চরিত্র—কী থেকে ও কী কথা টেনে আনবে তা কি জানেন? তার চেয়ে ওকে সম্পূর্ণভাবে মন থেকে ছেঁটে ফেলে, ভুলে গিয়ে আবার আপনি আগের মালতীদি হ'য়ে উঠুন। এ-কথা আপনাকে আমি আগেও বলেছি, আবারও বলছি—আপনার অভাব কিসের। আপনার মতো বিদুষী মেয়ে, যেখানে গিয়ে দাঁড়াবেন সেখানেই ভালো কাজ পাবেন।'

'কাজ! আমি কেন কাজ করবো শুনি? ও নিজে কোনোদিন

কাজ করেছে? ওর আদরিণী স্ত্রী কোনোদিন কাজ করেছে? খাচ্ছে তো সব বাপের গদিতে বসে। আর আমি সে-বাড়ির একজন বিশেষ অংশীদার হ'য়ে একটা সামান্য চাকরি ক'রে জীবন কাটাবো? এর ওর দরজায় ধন্না দিয়ে বেড়াবো? না। কোনোমতেই না। সিদে আঙুলে তো ঘি উঠবে না। বাছাধনকে একবার আদালতের ঘোলটি খাওয়ালেই টেরটি পাবেন। গোপালনগরের বারো লক্ষ টাকার সম্পত্তির ছোটো বৌরানী হিসেবে আমার যা পাওনা তার একটি আধা পয়সা আমি ছাড়বো না ওর কাছে।'

কী আর জবাব দেবো। বুঝলাম, মালতীদি উদ্‌ভ্রান্ত। অসংলগ্ন। তাঁর চিরকালের শান্ত নম্র মুখ রাগের আগুনে লাল। চিরকালের মৃদু মালতীদি বারুদের মতো উগ্র।

একটু পরে আমার স্বামী এলেন, মালতীদি আমাকে ছেড়ে তাঁর সঙ্গেই আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন এবার।

হাত মুঠো ক'রে টেবিল চাপড়ে উগ্র হ'য়ে বললেন, 'এতোদিনও সয়েছিলাম, কিন্তু আর না। আর আমি ওকে ছাড়বো না। ও যেমন আমাকে পথের ধুলোয় মাড়িয়ে গেলো, ওর মাথাও আমি হেঁট করে দেবো সকলের কাছে। তার জন্যে আমাকে দিয়ে যা করাবেন তা-ই করবো, যা বলাবেন তা-ই বলবো। কষ্টের আমি শেষ সীমায় পৌঁচেছি অসিতবাবু, শুধু আপনি আমার সহায় হোন।'

'সেজন্যে আপনি ভাববেন না,' আমার স্বামী কোটটা খুলে সোফার পিঠে ঝুলিয়ে রেখে শান্ত গলায় বললেন, 'আমার সাধ্যমতো আমি আপনার পক্ষে দাঁড়িয়ে সবই করবো। তবে কী জানেন? এ-সব ভারি বিশ্রী ব্যাপার। প্রথমত টাকাকড়ির প্রশ্ন তো আছেই, তাছাড়া আপনার যিনি স্বামী, নরনারায়ণ চৌধুরী, তাঁর যদি কোনো বিবেক না থেকে থাকে, তাহ'লে খোরপোষ না-দেবার জন্য আপনার

বিরুদ্ধে তিনি এমন সব কদর্য প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেন যেটা স্ত্রী হিসেবে আপনার ভারি অপমানজনক বলে মনে হবে।'

'কী তিনি প্রমাণ করবেন? কী আমি করেছি? তাঁর প্রতি একনিষ্ঠতা ছাড়া আর আমার কী দোষ আপনারা দেখেছেন? সত্য নেই? ধর্ম নেই? পাপের শক্তি কী এতোই বড়ো যে কোর্টে দাঁড়িয়ে শুধু কতগুলো মিথ্যে কথা ব'লেই লোকটা জিতে যাবে? আর টাকা! টাকা আমি যে ক'রে পারি যোগাড় করবো, আমি দেখবো নরনারায়ণ চৌধুরী কী ক'রে আমাকে তার স্ত্রী ব'লে অস্বীকার করে। অসিতবাবু, শুধু আপনি আমাকে দয়া করুন।'

'না, না, দয়ার কথাই উঠছে না এখানে। আপনি কাল আপনাদের বিবাহের কাগজপত্র সব নিয়ে এলেই আমি যা করবার সব করবো।'

বেয়ারা চা আর খাবার নিয়ে এলো, আমি বললাম 'ভিজে এসেছেন, শাড়িটা তো শরীরেই শুকোলেন, মাথাটাও ভালো ক'রে মুছলেন না, এবার শান্ত হ'য়ে খেয়ে নিন তো একটু।'

এ-কথায় আমার দিকে তাকিয়ে মালতীদি সংবৃত হলেন, তাঁর চোখে লজ্জার ছায়া ভাসলো। চোখ নামিয়ে বললেন, 'এতোক্ষণ ধ'রে বড়ো চেঁচামেচি করছিলাম, না রে? এই আমার মস্ত দোষ হয়েছে। এতো রাগ হ'য়ে যাই আজকাল যে কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।'

চা ঢেলে দিয়ে বললুম, 'সেটাই যা একটু বাঁচোয়া। এতোকাল এতো বেশি কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন যে এখন একটু তার অভাব ঘটাই মঙ্গল। আরো কিছু আগে ঘটলে আরো ভালো হ'তো।'

'তুই আমার সবই ক্ষমা করিস দেখছি। আমার সব ব্যবহারেরই

সদর্থ খুঁজে পাস। তা নৈলে ভদ্রলোক ক্লান্ত হ'য়ে কোর্ট থেকে ফেরা মাত্রই আমি যেরকম ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম তাতে তোর রাগ করাই উচিত ছিলো।'

আমার স্বামী হেসে বললেন, 'উনি জানেন এই উকিল ভদ্রলোকটি ঐটুকুর জন্যই সারাদিন কোর্টে গিয়ে শিকারীর মতো ওৎ পেতে ব'সে থাকেন। মাকড়শা যেমন জাল বিস্তার ক'রে পোকা ধরে, আমরাও তো তেমনি ক'রেই মক্কেল ধরি কিনা। আর আপনি হলেন আমার সাধা লক্ষ্মী, আপনার উপর কখনো উনি রাগ করতে পারেন ?'

এ-কথায় মালতীদি সরল গলায় হেসে উঠলেন, আমিও হাসলাম। তারপর প্রসঙ্গ বদলে অন্য কথাবার্তায় সহজ হ'য়ে উঠলো আমাদের চায়ের আসরটি।

বিদায় নেবার সময় সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে মালতীদি বললেন, 'আমি ঐ টালিগঞ্জের বাড়িটা কিন্তু ছেড়ে দিয়েছি রে।'

'তা-ই নাকি ? বলেননি তো।'

'মনে ছিলো না।'

'কবে ছাড়লেন ?'

'এই তো আজ। ছাড়লাম মানে বাড়িওলা তুলে দিলো।'

'তুলে দিলো !'

'কী করবে, ভাড়া পাচ্ছিলো না ঠিকমতো। সকালে বেরিয়েছিলাম খানিকক্ষণের জন্য, ফিরে গিয়ে দেখি জিনিসপত্র সব উঠোনে ছড়ানো, ঘর-দোর ধোয়ানো হচ্ছে। কী ব্যাপার ? না, নতুন ভাড়াটে ঠিক হয়েছে।'

'তারপর ?'

'তারপর একটা ট্যাক্সি ডেকে জিনিসপত্র নিয়ে এক আত্মীয়ের

বাড়ি উঠলাম গিয়ে। শীগ্গিরই একটা আস্তানা খুঁজে নিতে হবে আর কি।'

'ভারি তো ইতর আপনার বাড়িওলা।'

'বেশি আর কী। বাড়ি ছাড়তে একমাস ধ'রেই বলছিলো। ভাড়া বাকি প'ড়ে গিয়েছিলো অনেক, শোধ না-ক'রে তো আর উঠতে পারি নি, পরে দেবো বললেও বাড়িওলা বিশ্বাস করবে না, জিনিস আটকে রাখবে। কাল রাত্রে ভাড়াটি পেয়েই সকালে ব্যবস্থাটা পাকা ক'রে নিয়েছে। মেজাজটা তো আমার সেজন্যেই এতো খারাপ হ'য়ে গিয়েছিলো। তুই-ই বল, বাড়ি ফিরে যদি বাড়ি না পাই কেমন লাগে?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'আপনি বাড়িওলাকে কিছু বললেন না?'

'কী আর বলবো। ওর সঙ্গে আমি কী কথা বলতে পারি? ভাড়া দিতে পেরেছি, সেটুকুই আমার জবাব।'

'আমি হ'লে অন্য জবাব দিতাম।'

আমার রাগি মুখের দিকে তাকিয়ে মালতীদি হাসলেন।

আমি দু পা এগিয়ে এসে মালতীদির হাত জড়িয়ে ধরলাম, 'চলুন, আপনার বাড়িওলার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আসি, জিজ্ঞেস ক'রে আসি মালিকের অনুপস্থিতিতে তাঁর জিনিসে সে হাত দিয়েছে কোন্ অধিকারে।'

গভীর স্নেহে কাছে টেনে নিয়ে আদর করলেন মালতীদি, ঠিক ছেলেবেলাকার মতো ক'রে আমার গালে আস্তে একটি টোকা মেরে বললেন, 'পাগলি।' তারপর তরতর ক'রে নেমে গেলেন। আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'শুনুন, কাল আসছেন তো?' মালতীদিও তাঁর পক্ষে যতোটা সম্ভব গলা তুলে বললেন, 'নিশ্চয়ই।'

'কাল থেকে কিন্তু এখানেই থাকতে হবে, যতোদিন বাড়ি না পান।'

'খুব ভালো কথা—' মালতীদির গলা মিলিয়ে গেল।

মালতীদির সঙ্গে তাঁর সুস্থ অবস্থায় সেই আমার শেষ দেখা।

১৪

কথামতো পরের দিন মালতীদি আসেননি। তারপরের দিনও না, তারপরেও না। কতো ভাবলাম, কতো চিন্তা করলাম, কতো মন-খারাপ হ'লো, তবু মালতীদি এলেন না। ঠিকানাও জানি না যে খোঁজ নেবো। একদিন ওঁর পুরোনো বাড়িতেও গেলাম, যদি বা কোনো হদিশ মেলে। নতুন ভাড়াটে এসে জঙ্গল-টঙ্গল সাফ করিয়ে বাড়ির চেহারাটা একটু ফিরিয়েছে দেখলাম। উঠোনের রোদ্দুরে অনেকগুলো ছেলেমেয়ে খেলা করছিলো, আমার সব কথার জবাবেই তারা জিব দেখালো, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করলো, বক দেখেছো বললো, ভেংচি কাটলো, হেসে এ ওর গায়ে ঢ'লে পড়লো। অন্য গলার সাড়া পেয়েই বোধ হয় ভেতর থেকে তাদের ব্যতিব্যস্ত মা যখন রান্না করতে-করতে ছুটে এলেন খুন্তি হাতে, ছেলেরা অমনি এক মুহূর্তে হাওয়া হ'য়ে কোথায় পালিয়ে গেলো। খাটো অসংবৃত আঁচল টানতে-টানতে ভদ্রমহিলা বললেন, 'আসুন, বসুন, জঙ্গলের মধ্যে থেকে-থেকে ছেলেগুলো জংলি হ'য়ে গেছে। স্বামী ফরেস্ট অফিসে চাকরি করেন কিনা, লোকজনের মুখতো ওরা দেখে না, সব একেবারে বেবুনের বংশধর। আর কলকাতা এসেও কী জায়গাতেই

না ঠাঁই মিলেছে। দিনের মধ্যে কমসে কম গুটি দশেক কিল পিঠে না-পড়লে কি আর এরা শায়েস্তা থাকে ?'

বাচ্চাগুলোর ব্যবহারে হতভম্ব হ'য়ে গিয়েছিলাম, তাদের মার কথায় কৌতুক বোধ করলাম। বললাম, 'সব কটিই আপনার ?'

'আবার কার ? শেষের দু'বার তো আবার ডবল প্রমোশন। এই রেটে চললেই হয়েছে আর কী।'

'দু' একটি যমজ আছে বুঝি ?'

একগাল হাসলেন ভদ্রমহিলা, 'নৈলে বিয়ে হয়েছে সাত বছর, আটটা বাচ্চা হবে কেমন ক'রে।'

মহিলার কথা শুনে না-হেসে পারলাম না।

'আসুন না', উষ্ণ অভ্যর্থনায় আমাকে বারান্দায় মোড়া এনে পেতে দিলেন। জাঁকিয়ে ব'সে বললেন, 'লোকজন এতো ভালোবাসি, অথচ কপাল দেখুন। এসেছি অবিশ্যি মাত্রই কয়েক মাসের জন্য। আবার চ'লে যাবো। বাড়িটা বিশ্রী।'

'এখানে আমার এক বন্ধু থাকতেন—' এতোক্ষণে আমি আমার বক্তব্যে আসবার সুযোগ পেলাম।

ভদ্রমহিলা লুফে নিলেন কথাটা। 'আপনার বন্ধু ? কে বলুন তো ? আমাদের আগে তো শুনেছি মস্ত এক জমিদারের স্ত্রী থাকতেন, তিনি নিজে আবার মস্ত লেখিকা। আমি তাঁর বই পড়েছি। খুব ভালো লেগেছে। এখানে ঐ বামুনপাড়ার ছোঁড়ারা মিলে একটা লাইব্রেরি করেছে না, সেখান থেকে এনেছিলাম। বন-জঙ্গলে থাকি, রক্তমাংসের মানুষ তো আর দেখি না, আমার স্বামী বলেন তার চেয়ে বইয়ের মানুষেরা নাকি ঢের ভালো, ঢের বেশি নিরীহ। উনিই আমার এই বিশ্রী বইপড়া রোগ ঢুকিয়েছেন।'

তাই এখানে এসেও খুঁজে-পেতে লাইব্রেরিটা বার ক'রে চাঁদা দিয়ে তার মেম্বর হ'য়ে নিয়েছি।'

আমি আগ্রহান্বিত হ'য়ে বললাম, 'তাঁকে কি আপনি দেখেছেন? তাঁর কেনো খবর কি আপনি—'

'কপাল আমার! আস্তো একজন লেখক মানুষকে চোখে দেখবো আমার কি তেমন ভাগ্য! বাড়ি নেবার সময় বাড়িওলাই ফলাও ক'রে বলেছিলেন সে-কথা। মালতী দেবী নাকি এ-বাড়িতে ব'সেই ওঁর সব লেখার খোরাক পেয়েছেন। ছ'টি মাস তিনি এখানে অজ্ঞাতবাস ক'রে গেছেন শুধু প্রকৃতির শোভা থেকে লেখার কাজ সংগ্রহ করবার জন্য। হ্যাঁ ভাই, বলুন না, লেখকরা কি সবাই অমনি ক'রে লেখেন?'

লেখক সম্পর্কে ভদ্রমহিলার কোনো কৌতূহল আমি নিবারণ করতে পারলুম না। বাড়িওলার ধৃষ্টতায় অবাক হ'য়ে, যাবার জন্য পা বাড়িয়ে বললুম, 'আমি আমার সেই বন্ধুর খোঁজেই এসেছিলাম।'

'কেন, এ-বাড়ি ছেড়ে কোথায় গেছেন জানিয়ে যাননি আপনাদের?'

'না।'

'ঐ দেখুন, আবার কোথায় গিয়ে ডুব মেরেছেন কে জানে। এঁরা হলেন সাধকের মতো মানুষ, যতো লোকচক্ষুর আড়ালে থাকবেন ততোই ওঁদের কাজ ভালো হবে বেশি। শুনেছি নিঃসন্তান। তা তো হবেনই। আমাদের মতো শুয়োরের পাল জন্ম দিতে তো আর আসেননি সংসারে।'

হয়তো তা-ই। কথাটা শুনলে মালতীদি সুখী হতেন। হাত জোড় ক'রে বললাম, 'এবার তবে আসি?'

'এখুনি? আপনার সঙ্গে যে এখনো আমার পরিচয়ই হ'লো না।'

'আবার আসবো একদিন। দেখে গেলাম, বেশ লাগলো।'

সত্যি বেশ লাগছিলো।

তিন মাস পরে মালতীদির এক আত্মীয়ের মুখে শুনলাম, মালতীদি হারিয়ে গেছেন। আমি অবাক হ'য়ে বললাম, 'হারিয়ে গেছেন মানে?'

আত্মীয়টি বললেন, 'তা ছাড়া আর কী বলা যায়, সকালবেলা ভালোমানুষ বাড়ি থেকে বেরুলো, আর ফিরলো না।'

'সে কী!

'যথারীতি হাসপাতাল, পুলিশ, ইত্যাদি সব রকমই করে-ছিলাম।'

স্তব্ধ থেকে বললাম, 'উনি ওঁর টালিগঞ্জের বাড়ি ছেড়ে যাঁর বাড়ি গিয়ে উঠেছিলেন তাঁকে কি চেনেন আপনি?'

'আমার বাড়িতেই তো উঠেছিলো।'

'আপনার বাড়িতে?'

'হঠাৎ একদিন এসে হাজির। বলে, বিপদে পড়েছি, মামা, কয়েকদিনের জন্য একটা ঘর আমাকে ভাড়া দিন। আমি বললাম, ভাড়া কী রে? অসুবিধেয় পড়েছিস, যে-ক'দিন থাকবার থাক। ছোটো একটা ঘরে ছেলেমেয়েরা পড়তো, তাড়াতাড়ি সেটা ঠিক ক'রে দিলুম। সব মিলিয়ে দেড়টি বেলা হয়তো ছিলো, তারপরেই যে বেরুলো—আমার মনে হয় কী, জানো?' ভদ্রলোক গলা খাটো ক'রে বললেন, 'ঐ নরনারায়ণই ওকে সরিয়েছে।'

'নরনারায়ণই ওঁকে সরিয়েছে?' আমার দুই চোখ বড়ো হ'য়ে উঠলো।

'মানে, কোথাও আটক-টাটকে রেখেছে আর কি। মামলা করবে-করবে ব'লে তো একেবারে খেপে উঠেছিলো, তা করবি কর। এতো বলা-কওয়া কিসের? হাজার হোক, অত বড়ো একটা জমিদার, মানী লোক, এ-রকম একটা মামলা হ'লে দেশে তো একটু ঢিঢিক্কার উঠতোই। তাছাড়া শুনেছি রাজা রাঘবেন্দ্রনারায়ণ নাকি এ-বিয়ের খবর জানতেন না। জানলে ছেলেকে তৎক্ষণাৎ গদি থেকে সরাতেন। জানি সব। ওরা তো আমাদের অজানা ঘর নয়। রাঘবেন্দ্র হচ্ছে একটা বাঘ। এক বৌ থাকতে বাপকে না জানিয়ে যেমন-তেমন ঘরের যে-কোনো একটা মেয়েকে বিয়ে করবে, আর জানবার পরেও তিনি চুপচাপ ব'সে থাকবেন, সে-পাত্রই সে নয়।' আমি চুপ হয়ে গেলাম। ভদ্রলোক একটিপ নস্যি নিয়ে গলা চড়িয়ে ভুরু কুঁচকে আবার বললেন, 'তা যাই বলো বাপু, মালতীরও আমি দোষ দেবো। সেই বা বলা নেই কওয়া নেই হুম ক'রে একটা বিয়ে করতে গেলো কেন? আর আত্মসম্মান ব'লেও কি কোনো পদার্থ নেই তোর? বেশ তো, মামলা করবি তো কর না, সে-সব আবার তাকে জানাতে যাওয়া কেন?'

'তাকে জানাতে গিয়েছিলেন?'

'আমার তো তা-ই মনে হয়। কথাটা অবিশ্যি আমার বড়ো মেয়েই প্রথম বললো। ওকে নাকি রাত্তিরে বলেছিলো শেষবারের মতো একবার স্বামীর সঙ্গে দেখা ক'রে আসবে, জেনে আসবে স্ত্রী হিসেবে তার ন্যায্য অধিকার নরনারায়ণ দেবে কি দেবে না, তারপর যা ব্যবস্থা করার করবে। তুমিই বলো, ঐ রকম একটা শয়তানের সঙ্গে যেচে সেধে পঞ্চাশবার এ-সব মিটমাটের কোনো মানে হয়? আমাদের চিদানন্দবাবু, ওর পিসতুতো ভাই, তিনি তো এ-সব কারণে ভীষণ চটা ওর উপর। বড়লোক স্বামী ব'লে কি এমন ক'রেই

পায়ের তলার সুখতলা হয়ে থাকবি? তুই নিজেই বা এমন একটা—'

নির্দিষ্ট ট্রাম এসে গেল, অর্ধসমাপ্ত কথা সেখানেই শেষ ক'রে উনি ট্রামে লাফিয়ে উঠলেন।

## ১৫

এক বছর পরে একটা চিঠি পেলাম ঃ

মণি,

কাল সন্ধ্যায় কলকাতা যাচ্ছি, তোর বাড়িতে উঠবো। শরীর ভালো নেই, কয়েকটা দিন থাকবো ভাবছি।

সামান্য একটা পোস্টকার্ডে মাত্র এই দু'টি লাইন। মুছে-মুছে যাওয়া ঝাপসা স্মৃতির পলিমাটি ভেদ ক'রে আবার মালতীদি উঠে এলেন মনের উপর-তলায়। আবার তিনি আমাকে ভাবালেন। ইতিমধ্যে এ-বাড়িতে আর-একটি শিশু জন্মেছিলো, নিজেদেরই জায়গায় অকুলোন হচ্ছিলো যথেষ্ট, মালতীদিকে কোন্ ঘরে থাকতে দেবো, তা নিয়ে চিন্তা করতে হ'লো একটু। আমার স্বামী বললেন, 'জানি না উনি কোথা থেকে আসছেন বা কী অবস্থায় আসছেন, তবে যদি রাজী থাকেন আমি কিন্তু খুব ভালো একটা কাজ যোগাড় ক'রে দিতে পারি। একেবারে আমার হাতেই আছে।'

আমি বললাম, 'হয়তো কাজই করছেন কোথাও, নইলে আছেন কী ক'রে। চিঠিটা প'ড়ে তো বেশ শান্তিতেই কাটাচ্ছেন মনে হচ্ছে।'

'দু-লাইনেরই চিঠি।'

'তা হ'লেও বোঝা যায় তো।'

'হবে।' ছোকরা চাকরটাকে নিয়ে আমার নিজের বসবার ঘরটাকেই ওলোট-পালট ক'রে মালতীদির জন্মে সাজাতে লেগে গেলাম। সোফাসেটি সব সব ঠেলে দিলাম দেয়ালে, ছোটো খাট এনে পেতে দিলাম জানালার তলায়, ছোটো লেখাব টেবিল এনে দিলাম একটা, একটা র‍্যাকে বই সাজিয়ে দিলাম কিছু, মেঝেতে কার্পেট বিছিয়ে ঘরখানা স্নুন্দর দেখাতে লাগলো। মনে মনে ভাবলাম, থাকে যদি, ক'টা দিন হয়তো ভালোই কাটতে পারবেন, ভালোই লাগবে ওঁর ঘরটা।

অপেক্ষা করছিলাম সন্ধ্যে সাতটা থেকেই, কিন্তু মালতীদি এলেন রাত ন'টায়। কী ব্যাপার? না, পথ ভুল ক'রে কেবল ঘুরেছেন এদিক ওদিক।

'পথ ভুল ক'রে?' অবাক না-হ'য়ে পারলাম না। অবিন্যস্ত বসনে ভূষণে, চলনে ভঙ্গিতে, মানুষটা যেন সম্পূর্ণ অন্যরকম হ'য়ে এসেছেন। ঘরে ঢুকে ক্লান্ত ভঙ্গিতে ধপ ক'রে ব'সে পড়লেন সোফার মধ্যে, একটু হেসে বললেন, 'শনির দশা চলেছে, পোড়া শোল মাছ পালিয়ে গেল নলের পাত থেকে, কলি প্রবেশ করলো কানের মধ্য দিয়ে, আর বনের মধ্যে আধখানা আঁচলে শুয়ে দময়ন্তী তাঁর দুই চোখের জলে আঁধার দেখলেন পৃথিবী।' আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন—'আয়, বোস। তোকে দেখলেই আমার সব দুঃখ জুড়িয়ে যায়! মনে হয়, সংসারটা শুধু জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়েই তৈরি নয়, কারো-কারো চোখে মুখে স্নুখ-শান্তির কথাও লেখা আছে। কেমন আছিস?'

'ভালো।'

'অসিতবাবু ভালো আছেন?'

আমি ঘাড় নাড়লাম।

'মেয়ে ভালো আছে?'

'ভালো। তার একটি ভাইও হয়েছে।'

'হয়েছে? একটা ছেলে হয়েছে তোর? আহা, ঈশ্বর তাকে রক্ষা করুন।' খবরটাতে মালতীদি কেমন অস্থির হ'য়ে পড়লেন। ছটফট ক'রে ন'ড়ে-চ'ড়ে ব'সে বললেন, 'কোথায়? কোথায় সে? নিয়ে আয়। আমি তাকে দেখি। কিন্তু কী দিয়ে দেখি বল তো? কী আছে আমার? সব তো গেছে। হ্যাঁ, এই আংটিটা এখনো আছে, ওটা আমি প্রাণে ধ'রে বিক্রি করতে পারিনি, এটাই ওকে দেবো।'

আমি বললাম, 'ব্যস্ত হবার কিছু নেই, সে এলে একদণ্ডে আপনাকে নাস্তানাবুদ ক'রে দেবে। আর আমার সঙ্গে কি আপনার কুটুম্বিতা যে ভদ্রতা ক'রে ছেলের মুখ দেখবার জন্য গিনি বার করতে হবে?'

'একটা ছেলের মুখ দেখা কি তুই একটা সহজ ঘটনা ব'লে মনে করিস? যা মানুষের সারাজীবনের ইচ্ছে। যা ইচ্ছে করি তা নাকি আমরা কখনোই পাই? তবু ইচ্ছে। ইচ্ছের দুরন্ত তৃষ্ণা। যতো দুঃখ, যতো বেদনা, সব তো ঐ ইচ্ছে থেকে। এই ইচ্ছে থেকেই তো যত যন্ত্রণার জন্ম। তবু তাকে মেরে ফেলতে পারি না, ভুলে যেতে পারি না, তার সঙ্গে কিছুই পারি না আমরা। শুধু অসহ্য কষ্টে ছটফট করি। এই ইচ্ছে কী? কে? দেখেছে কেউ? ছুঁয়েছে কেউ? না। তবু সে আছে, আত্মা হ'য়ে আছে, আছে বুকের মধ্যে যন্ত্রণা হ'য়ে। চেপে আছে শরীর মনের উপর ব্যর্থতার বোঝা হ'য়ে। তাই বিশ্বাস করতেই হয় কোনো এক অলৌকিক শক্তির উপর। যার নাম ঈশ্বর। যন্ত্রণায় কাঁদতেই হয় এই ব'লে —"হে ঈশ্বর, দয়া করো, দয়া করো। আমাকে বাঁচাও এই দুর্বৃত্ত

ইচ্ছের বন্ধন থেকে। ইচ্ছের এই অদম্য শক্তি থেকে, অদেখা আলোড়ন থেকে মুক্তি দাও আমাকে।” কিন্তু মুক্তি কোথায়? মুক্তি শুধু মৃত্যুতে। চুপ করলেন মালতীদি। দুই চোখ বুজে যেন ধ্যানস্থ হলেন। আমি হতভম্ব হ'য়ে একটু দাঁড়িয়ে থেকে রান্নাঘরে চ'লে এলাম চায়ের কথা বলতে। যখন ফিরে এলাম, দেখলাম আমার মেয়েকে আদর ক'রে কোলের কাছে বসিয়ে তিনি মৃত্যু বিষয়েই বোঝাচ্ছেন তাকে, বলছেন, 'মৃত্যু হচ্ছে মা, আর জীবন হচ্ছে বাবা, বুঝলে? মৃত্যু আমাদের বিশ্রাম, জীবন আমাদের কর্ম। কর্ম ক'রে-ক'রে যখন আমরা ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি তখন মা আমাদের ডাকেন, “ওরে আয় রে, একটু ঘুমুবি আয়। আমার কোলে মাথা রেখে একটু বিশ্রাম করবি আয়।” আমাকে দেখে খুকু সকাতরে তাকালো, আমি বললাম, 'ওকে ছেড়ে দিন মালতীদি, চা খেয়ে নিন একটু।'

'চা? দে।' মেয়েকে ছেড়ে সাগ্রহে চায়ের দিকে ঝুঁকে পড়লেন মালতীদি। চায়ের সঙ্গে অন্যান্য খাবারও আমি সাজিয়ে দিলাম প্লেট ভ'রে, মালতীদি গভীর মনোনিবেশে খেতে আরম্ভ করলেন। দুই চুমুকে এক কাপ চা শেষ ক'রে আর এক কাপ নিজেই ঢেলে নিলেন পট থেকে। বললেন, 'খুব ভালো চা, চমৎকার চা। আর খাবারও খুব ভালো। গিরিডিতে ওরা আমাকে যা চা দিতো! আর খাবার!' চোখে যেন জল এলো মালতীদির।

আমি চমকে উঠে বললাম, 'গিরিডিতে? গিরিডিতে ছিলেন নাকি?'

'তবে এলুম কোথা থেকে? নরনারায়ণটা এতো দুষ্টু, কেমন ভুলিয়ে-ভুলিয়ে নিয়ে গেলো জানিস?' আমাকে ও চাবি বন্ধ ক'রে রাখতো সারাদিন। আমিতো পালিয়ে এসেছি।'

'তবে আপনি নরনারায়ণ চৌধুরীর পাল্লাতেই পড়েছিলেন ?'

'আর বুঝলি ?' এক প্লেট খাবারের শেষ শিঙাড়াটি শেষ করলেন মালতীদি—'এবার একটা ছেলে আমার হ'তোই, একেবারে সব ঠিকঠাক। কেবল একটুর জন্যে আটকে গেল। তখন যে আমার কী মন-খারাপ হ'য়ে গেল।'

মালতীদির কথা শুনে আমি থ হ'য়ে তাকিয়েছিলাম, তিনি খুব গম্ভীর হ'য়ে বললেন, 'তাই ভাবছি কিছু গয়না গড়াবো। হাত কান গলা সব আমার খালি। মেয়েদের কি গয়না না হ'লে মানায় ? তুই-ই বল্।'

আমার আর বলবার কী ছিলো ? দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে রইলাম।

'আর সুন্দর না-হ'লে পুরুষ ভুলবে কিসে ? সবাই বলে আমার নাকি ছেলের মা হবার বয়স নেই। বললেই হ'লো! আসলে যেমন-তেমন ক'রে থাকি ব'লেই তো বুড়োটে দেখায় ? আর লোকে ভাবে বয়েস হ'য়ে গেছে। সেজন্যেই ভাবছি খান কয়েক রঙিন শাড়ি কিনবো। বয়েস-টয়েস তো আসলে সবই ফাঁকি ? সব ছুকরি সেজে থাকে, তাই। নৈলে ঐন্দ্রিলারই যেন কতো বয়েস কম। আহা-হা।'

'রাত্তিরে আপনি কি খান ?' আমি প্রসঙ্গটা বদলাবার চেষ্টা করলাম।

'তোরা কী খাস ?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন মালতীদি।

'ভাত।'

'ভাতের সঙ্গে কী খাস ? আজ কী মাছ রেঁধেছিস ?'

'আজ মাংস।'

'মাংস!' মালতীদির চোখ দুটো একেবারে চকচক ক'রে

উঠলো। 'আজ মাংস, সে তো খুব ভালো কথা। মাংস আমি ভয়ানক ভালোবাসি। আর যদি গ্রাম-ফেড মটন হয়, তাহ'লে তো কথাই নেই। দই আর আস্তো-আস্তো মশলা দিয়ে তার যা রান্না, আঃ। যদি খাসি হয় সেও মন্দ নয়। মশলা মাখিয়ে দিয়ে বিনা জলে কেবল ক'ষে-ক'ষে যদি রাঁধিস, চমৎকার। তাই ব'লে মাছেরাও কিছু কম যায় না। ধর গিয়ে বড়ো পোনার পেটি, চেতল মাছের পেটি, আড় মাছের ল্যাজা, সে কি সোজা নাকি? আর তেল-কই? চাটালো-চাটালো কাজলের মতো কৈ এনে তুই যদি মটরশুঁটি আর পেঁয়াজবাঁটা দিয়ে রাঁধিস তাহ'লে আর দেখতে হবে না। শোন, এক কাজ কর, আমাকে রাত্তিরের খাবারটা এখুনি দিয়ে দে। বুঝলি না? শরীর তো ভালো না, দেরি করলে হজম হবে না শেষে।

স্তিমিত গলায় বললাম, 'হাত মুখ ধোবেন না? ট্রেন থেকে এলেন।'

'হাত-মুখ? ধোবো'খন। একেবারে খেয়ে উঠেই ধোবো।'

কী আর বলবো। উঠে গিয়ে খাবার সাজিয়ে দিলাম টেবিলে। চায়ের সঙ্গে যা দিয়েছিলাম স্বাভাবিক অবস্থায় মালতীদি তা দেখলেও মূর্ছা যেতেন, আর তার পরেই ভাত খেতে বসা। কিন্তু মালতীদি খেলেন। খুব পরিপাটি ক'রেই খেলেন। খেতে-খেতে যে কী বললেন আর না বললেন, কোনো কথাই কানে গেলো না আমার। আমার মন কোথায় কত দূরে ঢাকা শহরের রমনা পাড়ার একটি ছোট্ট বাড়িতে ঘুরে-ফিরে বেড়াতে লাগলো। খাওয়া বিষয়ে উদাসীনতা, আর তার চেয়েও বেশি অহেতুক লজ্জা মালতীদির চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ ছিলো। এই নিয়ে আমরা তাঁকে কতো ঠাট্টা করেছি। মাসিমা ( মঞ্জুশ্রীর মা ) বলেছেন, 'জানিস না বুঝি? ও যে আরজন্মে গন্ধর্বদের মেয়ে ছিলো। সেখানে নীল

সরোবরে লাল পদ্মের নৌকোয় ব'সে হালকা শরীরে চাঁদের মতো হালকা রঙের শাড়ি প'রে ফুরফুরে বাতাসে বীণা বাজিয়ে বেড়াতো। সেখানে তো কেউ খায় না, কেবল দিবস-অন্তে সোনার গাছে হীরের ফলের দিকে মুহূর্তের জন্য চোখ তুলে তাকায়।'

আমরা হাসতাম। পাশাপাশি খেতে ব'সে নরম হাতে কাঁটা-চামচেটি দিয়ে এইটুকু আতপ চালের এক চামচে ভাতের সঙ্গে একটু মাখন, একটু আলুসেদ্ধ, সামান্য একটু তরকারি দিয়ে খাওয়া সাঙ্গ ক'রে লাজুক মুখে মালতীদিও হাসতেন। মাছ মাংসের গন্ধ পেতেন তিনি, খেতে পারতেন না। তাই নিয়ে তাঁব কুণ্ঠার অন্ত ছিলো না। মালতীদির চোখে মুখে চেহারায়, গায়ের অসাধারণ পাতলা চামড়ায়, সরলতায়, কোমলতায়, চোখের দৃষ্টির সুদূরতায় সত্যি যেন এই ধুলোমাটির পৃথিবীর ছাপ ছিলো না কোনো। সেই মালতীদিকেই আমার মনে পড়তে লাগলো বারে-বারে। বারে-বারে এই মালতীদি ঝাপসা হ'য়ে যেতে লাগলো আমার চোখে।

সেই রাতটা ছিলেন মালতীদি। কিন্তু পরের দিন সকালে উঠে আর তাঁকে দেখতে পেলুম না। কখন যে গেলেন বলতেও পারলো না কেউ। আর তারপর কাল। কাল আবার দেখলুম মালতীদিকে।

ভাগ্য। সবই ভাগ্য। এতোদিনে মনে হ'লো ভাগ্যের বিরুদ্ধে কিছুই করবার নেই মানুষের। ধর্ম-মিথ্যা, সত্য মিথ্যা, বিবেক মিথ্যা, সব মিথ্যা। ভাগ্যই একমাত্র পরম সত্য। এতোকাল ধ'রে গল্পে উপন্যাসে ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের যতো কাহিনী শুনেছি, কোনোটাই তার অসত্য নয়। ভাগ্য যাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না।

আমার স্তম্ভিত মুখের দিকে তাকিয়ে, সুবীর বললো, 'মামী, কী ভাবছো ?'

রুমালে চোখটা ঘষে নিয়ে বললাম, 'জানি না।'

চুপ ক'রে থেকে সুবীর বললো, 'মন-খারাপ করছে ?'

এ-কথা শুনে কলকাতা শহরটা যেন বৃষ্টিভেজা মেঘে মোছা একটা বোবা রাত্রির মতো আবছা হ'য়ে গেলো আমার চোখে। টের পাইনি কখন দপ্‌ ক'রে আলো জ্ব'লে উঠেছে, উল্লাসে নেচে উঠেছে চৌরঙ্গি পাড়ার রাস্তা, দোকান, অলিগলি সব। অনেকক্ষণ পরে হীরার দ্যুতির মতো সেই উজ্জ্বল আলোয় দূরে তাকিয়ে দেখলাম মালতীদির কম্বলমোড়া ছায়ামূর্তিটাকে কে যেন ফেরাজিনির দরজা থেকে জোরে ঠেলে দিলে। কনুইয়ে ভর ক'রে মুখ থুবড়ে মালতীদি ঝপ্‌ ক'রে একটা বস্তার মতো প'ড়ে গেলেন ওদের টব-সাজানো আধখানা সিঁড়িতে। পোষাক-আঁটা দরোয়ান পায়ের ঠোক্করে সেই আধখানা দেহকে সম্পূর্ণভাবে ফুটপাতে ঠেলে দিয়ে সেলিউট ক'রে স্প্রিং-আঁটা হাফ-ডোর মেলে ধ'রে স'রে দাঁড়ালো। একজোড়া সাদা পায়রার মতো আলিঙ্গনাবদ্ধ একজোড়া সাহেব-মেম কলহাস্যে ঢুকে গেল ভেতরে।